স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা

৭৪ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা।। ২০ ডিসেম্বর, ২০২১।। ৪ পৌষ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

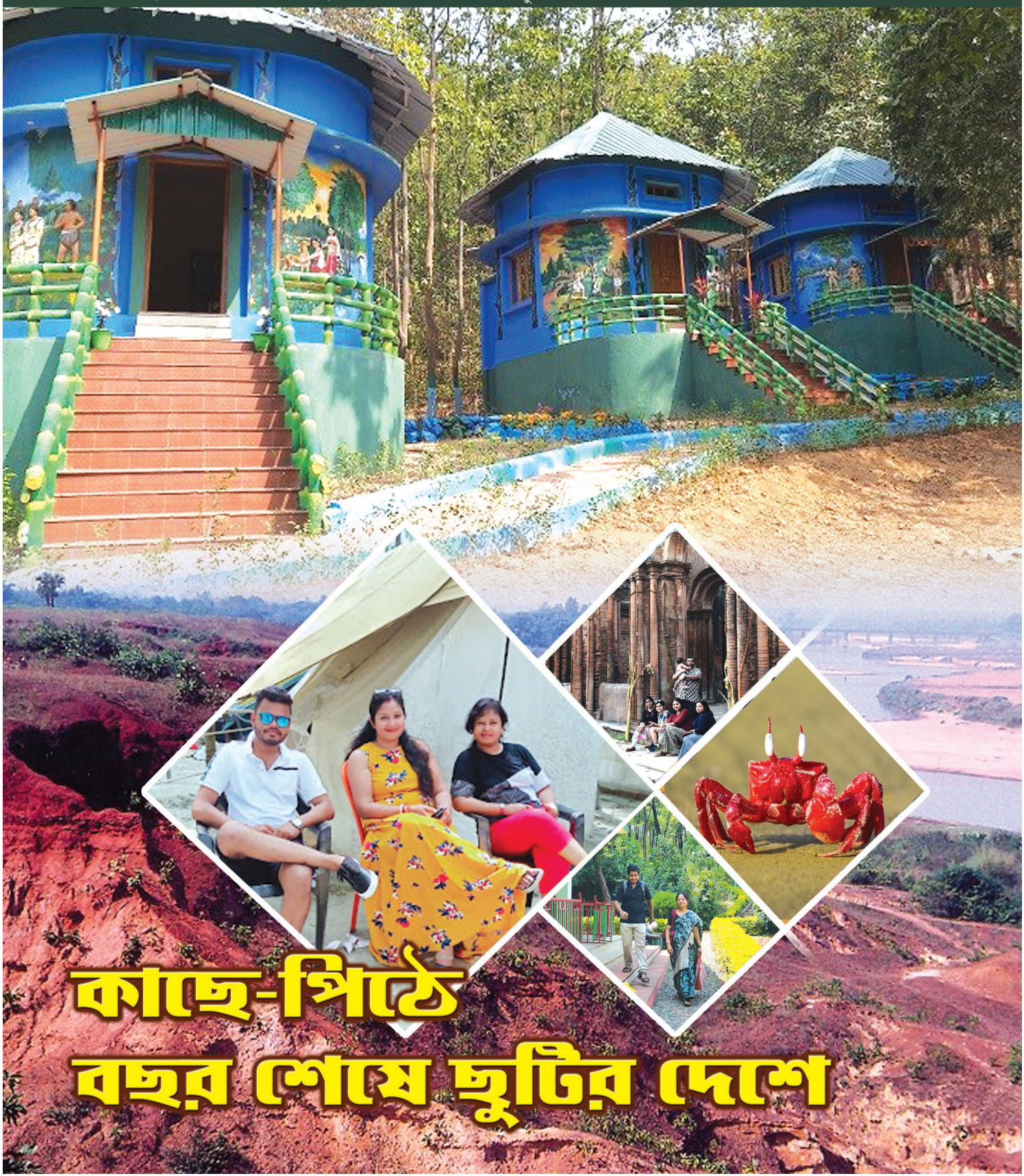

কাছে-পিঠে
বছর শেষে ছুটির দেশে

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৫ সংখ্যা, ৪ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২০ ডিসেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

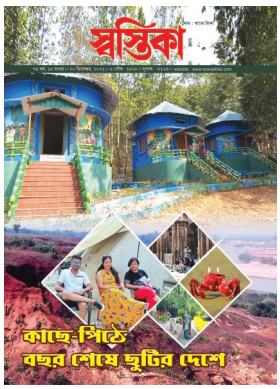

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'আইপ্যাকে প্যাকআপ মমতা', ঘরে বাড়ছে ক্ষোভ
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দূষণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

পশ্চিমি মানদণ্ডে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা অযৌক্তিক
□ আর. জগন্নাথন □ ৮

বাস্তব পরিস্থিতিই হিন্দুদের রক্তাক্ত ইতিহাস মনে করিয়েছে
□ বিশ্বামিত্র □ ১০

অন্য বড়োদিনে অনন্য অমৃতের পুত্ররা
□ নিখিল চিত্রকর □ ১১

ভারতের জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশদের অবদান—নিছক ভ্রান্ত ধারণা □ পুলকনারায়ণ ধর □ ১৩

মিজোরাম : জেলা থেকে রাজ্য □ জহরলাল পাল □ ১৫

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যু ভারতের কাছে দুর্ভাগ্যজনক
□ শ্যামল পাল □ ১৭

সাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত চাওয়া
□ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৮

বছর শেষে ছুটির দেশে □ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৩

ডুয়ার্সের বৈঠকখানা থেকে দুয়ারসিনির হেঁশেলে
□ অনামিকা দে □ ২৬

হাত বাড়ালেই তীর্থক্ষেত্র, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির
□ ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় □ ২৮

গীতা ও মনুষ্য জীবনের রহস্য □ রাকেশ দাস □ ৩১

ইহজীবনে চলার পথে গীতাই পথপ্রদর্শক
□ রামানুজ গোস্বামী □ ৩৩

বিজ্ঞান-শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস
□ পিন্টু সান্যাল □ ৩৫

পশ্চিমে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের চর্চা হয় না □ দীপক খাঁ □ ৩৭

বালোচরা জীবন দিয়ে বুঝেছে পাকিস্তান কোনো সভ্য দেশ নয় □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার ৩০ □ খেলা : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ২৭ ডিসেম্বর ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৭ ডিসেম্বর ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি কল্পতরু হয়েছিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' সেই থেকে দিনটি বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরণের দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাঙ্গালির চৈতন্য কি জেগেছে? নাকি এখনও বাঙ্গালি নিশ্চেতন? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কল্পতরু উৎসবের প্রেক্ষাপটে বাঙ্গালির চৈতন্য জাগরণ নিয়ে আলোচনা করবেন কল্যাণ চক্রবর্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার **২৪ জানুয়ারি ২০২২** তারিখের সংখ্যাটি **'স্বাধীনতা-৭৫'** বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির **মূল্য ৫০.০০ টাকা**। এই তথ্যবহুল সংখ্যাটি অধিকাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য সহযোগিতা করুন। আপনার কত কপি প্রয়োজন আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জানান যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঠিকমতো আপনাকে পাঠাতে পারি।

যোগাযোগ—

শ্রীজয়রাম মণ্ডল, মো: ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

৮৬৯৭৭৩৫২১৪

সম্পাদকীয়

ছুটির বাঁশি

শীতের রাত্রিতে দূরদূরান্ত হইতে ট্রেনের হুইসেলের ডাক যে মাধুর্য লইয়া কর্ণে আসিযা প্রবেশ করে তেমনটি বোধকরি অন্য কোনও ঋতুতে করে না। হুইসেলের ডাক রাতের কুয়াশায় মিলাইয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই শুনিতে পাওয়া যায় ট্রেনের চাকার ঘড় ঘড় শব্দ। রসিকজন বলিয়া থাকেন ইহাই ছুটির বাঁশি। ইহা একবার কর্ণের দেউড়ি পার হইয়া মর্মে প্রবেশ করিলে সুদূরের আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই কারণেই শীত আসিয়া পড়িলে বাঙ্গালির মন আনন্দে নাচিয়া ওঠে। প্রিয় গৃহকোণটিকে পিছনে ফেলিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হইল বাঙ্গালি ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় কোথায়? তাহার গতি কি নিয়ত দূরদূরান্তের অভিমুখে? গৃহ হইতে অনতিদূরে তাহার ভ্রমণপিয়াসী মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার মতো কোনও স্থান কি নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে দশ বৎসর আগেও বলা হইত আছে, তবে বেশি নাই। হাতের কড়া গনিয়া বাঙ্গালি ভ্রমণাভিলাষী বলিতেন, দিঘা আছে, দার্জিলিং আছে, শক্তিক্ষেত্র তারাপীঠ আছে, শিবক্ষেত্র তারকেশ্বর আছে। কিন্তু যে কথাটি তাঁহারা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না, কেবল মনে মনে চিন্তা করিতেন তাহা হইল, দিঘায় সমুদ্র থাকিলেও তাহাতে পুরীর মতো মায়া নাই। দার্জিলিংকে হিমালয় শুধুমাত্র অপরূপ সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে, কাশ্মীরের মতো প্রশান্তি প্রদান করে নাই। বিহার রাজ্যে শিমুলতলা মধুপুরে কিছুদিন কাটাইলে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, পশ্চিমবঙ্গে তেমন স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধান মাথা খুঁড়িলেও মিলিবে না। আর যদিও-বা মিলিবে সেইখানে সপরিবারে থাকিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। তাই বাঙ্গালি গত ষাট-সত্তর-আশি ও নব্বইয়ের দশক জুড়িয়া ছুটির বাঁশি শুনিলেই বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিত।

বর্তমানে বাঙ্গালির দিন বদল হইয়াছে। সরকারি উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে এমন কিছু স্থান যুক্ত হইয়াছে যাহা ইতোমধ্যেই বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি নির্বিশেষে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবিষ্কার করিয়াছেন হাওয়াবদল করিবার মন হইলে এক্ষণে আর পশ্চিমে যাইবার প্রয়োজন নাই। চাহিলেই জগন্নাথদেবের পুণ্যদর্শন হয়তো হইবে না কিন্তু হাতের কাছে পুরীর মতো মায়াবী সমুদ্রের সন্ধান অবশ্য মিলিবে। পাহাড় মিলিবে, অরণ্য মিলিবে। সপরিবারে সপ্তাহান্তে দুই-তিন দিনের জন্য অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গই কারিয়াছে, দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই। পর্যটনের মানচিত্রটিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে সাধুবাদ দিতেই হইবে। কিন্তু সরকার পর্যটনে বৈচিত্র্য আনিতে সফল হইলেও ইহাকে ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিজ্ঞাপনগুলি অতীব সাধারণ। তাহা মানুষের বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাকে প্রণোদিত করিতে অক্ষম। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হইল বিজ্ঞাপন নির্মাতারা অপেক্ষাকৃত নবীন স্থানগুলির পরিবর্তে দিঘা, দার্জিলিং, মালদহ, মুর্শিদাবাদের উপর জোর দিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের কথা উঠিলেই তাঁহারা তারকেশ্বর, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট বোঝেন– বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী বা বোলপুরের কঙ্কালীমাতাকে হিসাবের মধ্যে ধরেন না। টিভি খুলিলেই ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের পর্যটন কেন্দ্রগুলির বিজ্ঞাপন যত সহজে দৃষ্টিগোচর হয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাহা হয় না। ফলত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানিতেই পারেন না দিঘা ছাড়াও এই রাজ্যে জনপুট, বাগুরান জলপাইয়ের মতো সমুদ্রতট রহিয়াছে। গনগনির মতো নদী-পাহাড়বেষ্টিত মনোরম স্থান রহিয়াছে। জলদাপাড়া ছাড়াও ডুয়ার্সের অন্য অরণ্যানী রহিয়াছে। মানুষ ইহাদের কথা জানিতে পারে না। তাই এই স্থানগুলি নির্জনতার দৃষ্টান্ত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ সরকারের উদ্যোগ অশ্বডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। সরকার যদি অগ্রণী রাজ্যগুলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিত তাহা হইলে কেবলমাত্র যে এই সাধু উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে সফল হইত তাহাই নহে, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইত। আশা করা যাইতে পারে অদূর ভবিষ্যতে সরকার ভুল সংশোধন করিয়া অন্যান্য রাজ্যগুলির মতো পেশাদারি মনোভাবের পরিচয় দিবে। বিজ্ঞাপনে মুখ দেখাইবার সুযোগ পাইয়া এই নবীন পর্যটন কেন্দ্রগুলিও ছুটির বাঁশি বাজাইয়া ভ্রমণপিপাসু মানুষের মনকে উন্মনা করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। তখন আর তাহাদের নির্জনতার দৃষ্টান্ত হইতে হইবে না, মানুষের কোলাহলই বলিয়া দিবে চিরাচরিতের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারাও রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।

সঃ জীবতি মনো যস্য মননেনোপজীবিতঃ।।

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

‘আই প্যাকে প্যাক আপ মমতা’, ঘরে বাড়ছে ক্ষোভ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আই প্যাকেই কি ‘প্যাক আপ’ মমতা? আপাতত মজে আছেন তাতে। অন্যদিকে তৃণমূলে ক্ষোভ, ‘আই-প্যাক যা বলবে তাই করতে হবে?’ ক্ষোভ জানালেন দক্ষিণ কলকাতার এক তৃণমূল নেতা। পরামর্শদাতা সংস্থা ‘আই-প্যাক’-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ নতুন নয়। এর আগেও বিদ্রোহের আওয়াজ শোনা গিয়েছে। ধোপে টেঁকেনি। ২০২১-এর রাজ্য নির্বাচনে ‘আই-প্যাক’-এর সাফল্য সব ক্ষোভ মুছে দিয়েছে।

মমতা এখন উত্তরমুখী। লক্ষ্য : অজানা। হলফ করে বলতে পারি তা বিজেপি হটাও বা দিল্লি দখল নয়। পাখির চোখ ৫ রাজ্য। গোয়া, ত্রিপুরা, অসম, হরিয়ানা, মেঘালয়। সবকটাতেই কংগ্রেস ‘নিভু নিভু’। বকলমে আই প্যাক চালান প্রশান্ত কিশোর। মমতাকে পরামর্শ দেন। আড়াল থেকে রাজ্যের খুঁটি নাটি নিয়ন্ত্রণ করেন। অনেকে ঠাট্টা করেন তাদের উপদেশ ছাড়া ‘মমতা রাজ্যে’ পিঁপড়েও নড়ে না। দলের দিল্লির কিছু মাতব্বর নেতা তার লেজুড় হয়ে কাজ করে।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর তৃণমূল বাঁচাতে আসরে নামেন যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমদানি করেন প্রশান্ত কিশোর ও আই-প্যাককে। ২০২১-এর নির্বাচনে বড়ো সাফল্য পান অভিষেক। বিরাট ব্যাবধানে জয় পান মমতা। সুপ্রিমো মমতার পাশে বসার অধিকার লাভ করেন অভিষেক। তিনি প্রথম। তিনি শেষ। অভিষেকের পর আর কোনও উত্তরাধিকারী মমতা তৈরি করবেন বলে আমার মনে হয় না। যেমন সোনিয়া আর রাহুল বা প্রিয়াঙ্কা। অভিষেকের উত্থান থেকেই দল ও রাজ্যের কর্ম তিন ভাগে বিভক্ত। দল চালান অভিষেক। প্রশাসন মমতা। ভারমূর্তি তৈরি করে আই প্যাক। সেই সঙ্গে চলে মমতা আর অভিষেককে পরামর্শ দান।

এখন অবধি সব কাজে সফল আই-প্যাক। তার সর্বোচ্চ রেটিং। কলকাতা পুরভোট তার টুপিতে নতুন কিছু পালক গুঁজবে বলেই আমার ধারণা। তবে চ্যালেঞ্জ মে মাসে ১১১টি পৌরসভার ভোট আর ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এটাই ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের সেমি-ফাইনাল বলে আমার ধারণা।

বঙ্গ নির্বাচনে মমতার সাফল্যের পর ফিরে তাকাননি প্রশান্ত কিশোর। বিজেপির মতো কড়া শত্রুকে আটকে দিয়ে দম্ভের সঙ্গে জানান সংস্থা ছেড়ে দেবেন। তবে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি এখানে থাকতে এসেছে। জয়ের আনন্দে তৃণমূল নেতারা যেন তা ভুলে না যান। শোনা যাচ্ছিল কংগ্রেসে যোগ দেবেন। বাদ সাধলেন রাহুল। কিশোরের দুধে এক ফোঁটা চুনা পড়ল। পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন কিশোর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে ঘুরলেন মমতা। বিজেপিকে ছেড়ে দুজনেই কংগ্রেসকে আক্রমণের নিশানা করলেন। কিশোর জানালেন আগামী ৪০ বছর বিজেপি রাজনৈতিক সত্য। বিগত ১০ বছরে কংগ্রেস ৯০ শতাংশ নির্বাচন হেরে গিয়েছে। কেবল মোমবাতি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধিতা করে বিজেপিকে হারানো ‘না মুমকিন’, মানে সম্ভব নয়। তাই মোদী বিরোধী জোট কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে গড়তে হবে।

মমতা জানালেন কংগ্রেস চালিত ইউপিএ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই দিল্লি গেলেই সোনিয়ার সঙ্গে আর দেখা করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি না বললেও মমতা এখন নরেন্দ্র মোদীর মতোই কংগ্রেস মুক্ত ভারত চান। দুজনের লক্ষ্য এক হলেও পথ আলাদা। মোদীর লড়াই আদর্শগত আর পুরোনো। মমতার কৌশলগত আর জায়গা দখল। বিশ্লেষকদের মতে কংগ্রেস খতম যজ্ঞে এখন ‘মোদীর সহায়ক মমতা’।

মমতা জানেন মোদী বিরোধী মুখ হয়ে ওঠা কঠিন। কারণ জোট করে বিজেপি ১৮ রাজ্যে। কংগ্রেস ৬। তৃণমূল ১। ফলে মমতার অগতির গতি কিশোর আর আই প্যাক।

আগেও বলেছি। এ তত্ত্ব আমি মানি না। কারণ বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেস এখন অনেকটাই পিছিয়ে। ২০১৯ লোকসভা ভোটে ২০৪ আসনে সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ে কংগ্রেস। জেতে মাত্র ৬টি আসন। বিজেপি ৩০৩ আসনে জয়লাভ করে। তার মধ্যে ১৭৫টি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়। তাই নতুন করে মমতার সাহায্যের প্রয়োজন নেই বিজেপির। তবে বিজেপির বিরুদ্ধে নিশ্চিতভাবে বড়ো মুখ কংগ্রেস। কারণ ১৮টি রাজ্যে তাদের সংগঠন রয়েছে।

আগামীতে বিজেপিকে নিরঙ্কুশ হতে গেলে এই ১৮ রাজ্যে কংগ্রেসকে মুছে ফেলতে হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে তাই হয়তো মমতাকে প্রয়োজন মোদীর। মমতা সে কাজ করছেন। কংগ্রেস ভেঙে বদলিতে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করছেন। একাজে তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গী প্রশান্ত কিশোর।

মমতা জানেন মোদী বিরোধী মুখ হয়ে ওঠা কঠিন। কারণ জোট করে বিজেপি ১৮ রাজ্যে। কংগ্রেস ৬। তৃণমূল ১। ফলে মমতার অগতির গতি কিশোর আর আই প্যাক। ভোটকুশলী কিশোরের বাজার মূল্য বেশ ভালো। ২০১৪-র পর থেকে ৮টি নির্বাচনে ৭টিতেই জয়ী। ফসকে যায় কেবল ২০১৭-র উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। ২০১৪-য় মোদী আর ২০২১-এ মমতা তাঁর ক্লায়েন্ট। ২০২৪-কে হবে তার ক্লায়েন্ট? এখন সেটাই দেখার।

আর মোদী বিরোধী পাল্টা মুখ হতে হলে মমতাকে কংগ্রেস খতম যজ্ঞে নামতেই হবে। মমতা তা অস্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন মোদী বিরোধী যে কোনও জোটে তিনি অংশ নিতে রাজি। □

দূষণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মাননীয় দিদি,

দিল্লির দিকে তাকিয়ে দিদি আপনি এখন গোয়া নিয়ে ব্যস্ত। আপনি দেশের নানা বড়ো বড়ো শহরের কথা যখন বলেন তখন আমার খুব গর্ব হয়। যখন ভাবি আমার দিদি দেশের সব বড়ো বড়ো শহরের অধিপতি হবেন তখন স্বপ্নে ভরা চোখে আমার জলও এসে যায় মাঝে মাঝে। সে জল কিন্তু দুখের নয়, সুখের। আমি ভাবি বাংলা আজ যা ভাবছে ভারত তাই কাল ভাববে। না, আরও একটু এগিয়ে আমার ভাবনা। বাংলা গতকাল যা ভেবেছে সেটা আগামী কোনও কালে ভাববে ভারত। কিন্তু দিদি মাঝে মাঝে বিভিন্ন রিপোর্ট আমার গর্বের ফানুস ফুটো করে দেয়। চুপসে যায়।

এই যেমন জাতীয় পরিবেশ আদালতে পেশ করা কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট বলছে, কলকাতায় দৈনিক উৎপন্ন সাড়ে চার হাজার টন বর্জ্যের মধ্যে মাত্র ৫১৫ টনের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। অর্থাৎ, বাকি বিপুল পরিমাণ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের বাইরেই থেকে যায়। প্রসঙ্গত, দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট আইন আছে। কিন্তু 'মিউনিসিপ্যাল সলিড ওয়েস্টস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং) রুলস ২০০০' জারির পরেও কলকাতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জঞ্জাল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই যায়নি। একদিকে দৈনিক উৎপন্ন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, অন্যদিকে স্তূপীকৃত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজও যথেষ্ট গতি পায়নি। ফলে সামগ্রিক ভাবে জঞ্জাল ব্যবস্থাটাই ক্ষতগ্রস্ত হচ্ছে। কলকাতা দূষণকে প্রিয় ভেবে গলায় জড়িয়ে রেখেছে।

> দিদি আপনি বলবেন, শহরের জঞ্জালের সম্পূর্ণ দায় পুরসভার নয়, নাগরিকদেরও। সবাই সচেতন না হলে ফিরহাদ হাকিম একা কী করবে! কিন্তু যে সব খাবে তাঁকেই তো দুধের দামটা দিতে হবে দিদি।

এই চিঠি যখন লিখছি তখন কলকাতা পুরভোটের দামামা বাজছে খুব জোরে। একচেটিয়া ভোটের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েই শাসকশিবির ভোট করছে। আর দিদি, আপনি ভাবতেই পারেন এ সব কথা আপনাকে লিখছি কেন! কিন্তু দিদি আর কাকে লিখব! আপনিই তো সব। এই সরকার, এই কলকাতা, এই রাজ্য এমনকী আজকাল এই দেশ হিসেবেও আপনাকে আমি একমাত্র ঠিকানা ভাবতে শুরু করেছি।

দিদি, কলকাতা শহরের আবর্জনা জমা করার প্রধান জায়গা এখনও ধাপার খোলা মাঠ। অথচ, সেই ২০০১ সালেই ধাপার মাঠ 'ভর্তি' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। মানে শেষ ২০ বছর ধরে ভরা মাঠকেই ভরা চলছে। ওই অঞ্চলে বহু বছরের সঞ্চিত জৈব আবর্জনা পচে বিষাক্ত, অতিশয় দাহ্য গ্যাস তৈরি হচ্ছে। এই গ্যাসে আগুন লাগলে কী মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ অনেক বার সতর্ক করেছেন। জানিয়েছেন, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু প্রশাসনের টনক নড়েনি। না, রাজ্যের না, কলকাতা পুরসভার। ভাগাড়ে কয়েক দশকের সঞ্চিত বর্জ্যের দূষণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ— দুয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। সেই কারণেই দূষণ প্রতিরোধে ভাগাড়ে জমে থাকা স্তূপীকৃত বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করতে বছর দুই আগে সব রাজ্যকে কড়া বার্তা দিয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল, ধাপার ৬০ একর জমির সঙ্গে গার্ডেনরিচের ১৮ একর জমিকে স্তূপীকৃত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলে দৈনন্দিন বর্জ্য ফেলার জায়গার সমস্যা কিছুটা হলেও মিটবে। কিন্তু গার্ডেনরিচে সজীব বস্তু ব্যবহার করে মাটি, জল এবং এলাকার দূষণ কমানোর প্রক্রিয়া 'বায়ো-রেমিডিয়েশন' এখনও চালু হয়নি। ফলে, জমি পুনরুদ্ধার তো দূর অস্ত, প্রতি মাসে রাজ্য প্রশাসনকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হচ্ছে।

দিদি আপনি বলবেন, শহরের জঞ্জালের সম্পূর্ণ দায় পুরসভার নয়, নাগরিকদেরও। সবাই সচেতন না হলে ফিরহাদ হাকিম একা কী করবে! কিন্তু যে সব খাবে তাঁকেই তো দুধের দামটা দিতে হবে দিদি। শহরের সর্বত্র পচনশীল ও অপচনশীল জঞ্জাল আলাদা করার প্রকল্প চালু করার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগটাও বড়ো কম। ভয়ংকর পরিণতি দেখা যায় প্রতি বর্ষায় প্লাস্টিক জমে নিকাশি নালা বুজিয়ে যেমন জমা জল নামতে দেরি হয়, তেমনই ডেঙ্গির মশার বাড়বাড়ন্ত আতঙ্কের কার হয়ে দাঁড়ায়। সব মিলিয়ে কলকাতা বেঁচে আছে দূষণকে সঙ্গে নিয়েই। দূষণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান বলে গলায় টেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী, দিদি! □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

পশ্চিমি মানদণ্ডে ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা অযৌক্তিক

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এমন মনগড়া পদ্ধতিতে লিখেছিলেন যে তিনজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী শ্রীরামস্বরূপ, সীতারাম গোয়েল ও অরুণ শৌরী এগুলিকে জঞ্জাল আখ্যা দেন।

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ভারতের সংস্কৃতিকে সমূলে অস্বীকার করার একটি দীর্ঘমেয়াদি লজ্জাকর ইতিহাস তৈরি করেছেন বামপন্থী উদারবাদীরা। এই সূত্রে গত মাসেই বেশ কিছু আমেরিকান বুদ্ধিজীবী মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের দেশে 'ইউনিভার্সিটি অব অস্টিন' স্থাপনই করে ফেললেন। এর কারণ মূল ধারার বরাবরের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বামপন্থী উদারবাদীদের অসহিষ্ণুতা এবং দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত জীবন পদ্ধতি যাকে চলতি কথায় সংস্কৃতি বলে তাকে আদ্যন্ত বাতিল করার প্রবণতা। প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মার্কিনি শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসচর্চাকাররা জানাচ্ছেন--- শিক্ষাক্ষেত্রে, বিদ্যাচর্চায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ও তথাকথিত উদারবাদী অর্থে সম্পূর্ণ অনুদারবাদীদের ক্ষমতা দখল চূড়ান্ত অবক্ষয়ের সৃষ্টি করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ার ফলে তারা খোলাখুলি মত প্রকাশে কুণ্ঠিত হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছে।

উদারবাদী দাপটের প্রথম লক্ষণ দেখা যায় যখন বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অন্য অংশকে সহ্য করতে পারে না। দেখে করুণার সঙ্গে ধিক্কার জাগে সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবী যারা বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতা (তাঁদের ভাষায়) দেখে সর্বদা বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করেন, অথচ দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল হলেই তাদের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না। মুখ ফিরিয়ে নেন। বিশ্বের কোনো নাগরিক পরিসরে এই ধরনের একচেটিয়া অধিকার কায়েমের প্রচেষ্টা দেখা যায় না যা বামপন্থী উদারবাদীরা করে থাকেন। এর ফলে যথার্থ বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অবক্ষয় শুরু হয়েছে।

আমরা অবাক হয়ে যাই এই বামবাদীরা কেন একইসঙ্গে একটি হাইফেন দিয়ে নিজেদের উদারবাদী বলে লেখেন। আসলে অসহিষ্ণু বামপন্থীরা একটা গণতান্ত্রিক যুক্তিগ্রাহ্যতা জোটাতেই এই উদারবাদী কথাটি আত্মরক্ষার্থে বা কপটতা ঢাকতে জুড়ে নেন। এবং এই উদারবাদের তকমা চড়িয়ে তাঁরা রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বজনের (egalia tarion egalitarian) দল হিসেবে মান্যতা পেতে চান। কিন্তু এর ফল হয়েছে চরম ব্যর্থতা। আমাদের আশপাশে যেসব বাম-উদারবাদী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা সবাইকে নিয়ে চলতে তো পারেই না কার্যক্ষেত্রে তারা সাম্যবাদীও নয়, উদারবাদীও নয়। যাকে বলে না ঘরকা না ঘাটকা। বিশ্বের অনেক দেশেই পুঁজিবাদের ওপর মানুষের ভয়ংকর অবিশ্বাস ও উপর্যুপরি সমস্যা সৃষ্টির কারণে আশা করা গিয়েছিল এই পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তথা বাম উদারবাদীরা অতি উন্নতমানের কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করবেন। তার বদলে তাঁরা অর্থনীতি ও কলাক্ষেত্রে অতি নিম্নমানের কিছু তত্ত্ব আমদানি করছেন।

উদাহরণ দেখুন, ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় অর্থনীতির প্রবাদপ্রতিম Keyenes-এর তত্ত্বকে বানচাল করে এঁরা Modern Monetary theory (MMT) আমদানি করে ঢালাও নোট ছাপাবার নিদান দিলেন যতক্ষণ না মুদ্রাস্ফীতি বশে আসে। কিছুটা সময়ের পর মুদ্রাস্ফীতি আবার মাথাচাড়া দেওয়ায় এঁদের তত্ত্ব অতি নিঃশব্দে কবরস্থ হয়ে গেল। একটা তত্ত্ব যার অর্থনৈতিক আয়ু মাত্র কয়েক বছর, তাতেই প্রমাণ হয় বাম-উদারবাদীদের চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা। দ্বিতীয় উদাহরণ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রে নোবেল কমিটি সম্প্রতি উপযুক্ত প্রার্থীদের ছেঁটে ফেলার নতুন পন্থা নিয়েছে। এই বছরে এই কমিটি একসঙ্গে তিন জনকে অর্থনীতির নোবেলের জন্য মনোনীত করেছে। এরা কিন্তু কেউ একত্রে গবেষণা করেননি। এটা রীতিমতো সন্দেহজনক। কমিটি আগেভাগেই ভেবে রেখেছে এদের তত্ত্ব হয়তো সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। তিনজন থাকায় ধরা মুশকিল হবে কে ব্যর্থ। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে জনৈক Card শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতনের বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অভিঘাত নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৯০ সালের শ্রম বাজার পরীক্ষা করে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি হলে 'does not lead to fewer jobs' শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হলে তাদের নিযুক্তি সংখ্যা কমে যায় না। অর্থাৎ চালু শ্রমিকের মাইনে বাড়লে ভবিষ্যতে টাকা বাঁচাতে মালিক নতুন চাকরি কমায় না। তাই না কি?

বাস্তবে বেতন বৃদ্ধির ফলে যদি ব্যবসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব অর্থাৎ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মালিক শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে আনে। শ্রমিক অবসর নেওয়ার পর নতুন নিযুক্তি হয় না বা

ব্যবসা বৃদ্ধি পেলেও বাড়তি লোক নেওয়া খুব মেপে যুপে হয়। হ্যাঁ, মাইনে বাড়লেই রাতারাতি শ্রমিক ছাঁটাই হয় না। বড়ো বড়ো অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে পড়লে মালিকরা সেই অজুহাতে অজস্র কর্মী ছেঁটে ফেলেন, যেমন বিশ্বমন্দা বা সদ্য কোভিড মহামারীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে। তারা জানে এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ছাঁটাই নিয়ে কোনো রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেবে না।

তাহলে ন্যূনতম বেতন অবশ্যই তার প্রভাব ফেলে এবং তা ধীরে ধীরে খেপে খেপে হতে পারে। বর্তমানে স্বনিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বাজার বিরোধী অবস্থান নেওয়াটাকে fashion-এ পরিণত করেছেন। নোবেল কমিটিও এদের মন রাখতে পুঁজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি অসার তত্ত্বকেই সম্মান দিয়েছেন।

আবার বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে দেখুন এই বাম-উদারবাদীরা কী আজব তত্ত্ব ছেড়েছে। তারা critical race theory (CRT) অনুযায়ী বলছে আইন ও আইন সংক্রান্ত সমস্ত সংস্থাই বর্ণবৈষম্যবাদী। এক্ষেত্রে তোমার ব্যবহার বা আচরণ যাই হোক না কেন তুমি যদি শ্বেতাঙ্গ বা উচ্চবর্ণের লোক হও তাহলে আবশ্যিকভাবেই ধরে নিতে হবে তুমি বর্ণবৈষম্যবাদী বা জাতিবাদী, একথা নিশ্চিত। এই সেই আদি খ্রিস্টীয় তত্ত্ব তুমি যতই ভালো মানুষ হও না কেন আদিতে তোমার গাত্রবর্ণ বা জাতই প্রধান। উদারবাদের নামে এসবই পশ্চাদপদ ভাবনা নয় কি?

সিআরটি অনুযায়ী প্রাচীনকালের মতো জন্মসূত্রেই কোনো ব্যক্তিকে বর্ণ অনুযায়ী দাগিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে কোন মানুষ কোন জাতে জন্মাল সেই অনুযায়ীই তার পরিচয় এঁরা আগে ভাগেই ঠিক করে দিচ্ছেন। এই কারণে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের ভারতবর্ষে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে মানুষের মগজ ধোলাইয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য করে এসেছে বাম-উদারবাদীরা। কিন্তু হায়! আজকের তারিখে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার থাকলেও তাঁরা কি স্যার যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার বা কেএ নিলকান্ত শাস্ত্রীর মতো একজন ইতিহাসবেত্তাকেও হাজির করতে পারবেন? অথচ এঁদের সকলকেই তাঁরা এক কথায় সাম্প্রদায়িক লেখালেখি করা ঐতিহাসিক বলে নাকচ করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এমন মনগড়া পদ্ধতিতে লিখেছিলেন যে তিনজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী শ্রীরামস্বরূপ, সীতারাম গোয়েল ও অরুণ শৌরী এগুলিকে জঞ্জাল আখ্যা দেন। প্রথম দু'জন সম্পর্কে দেশীয় মানুষজন একটু কম জানলেও মূলধারার সংবাদমাধ্যমে কাজের সুবাদে শৌরীকে সকলেই জানেন। তিনি তাঁর প্রকাশ্য লেখালিখিতে দেখিয়েছেন কীভাবে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা রক্ষণশীল ইতিহাসবিদদের বাতিল করে দেন। বাম-উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা এককাট্টা হয়ে দক্ষিণপন্থীদের প্রামাণ্য কাজগুলিকেও ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। এতে রাজনৈতিকভাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠার সুবিধে হয়। ইতিহাসবিদ বিক্রম সম্পতের বীর সাভারকরের ওপর গবেষণালব্ধ বিশাল দুই খণ্ডের বইটির মধ্যে খুঁজে খুঁজে সাভারকরের জীবনের একটিমাত্র ঘটনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বইটিকে অস্বীকার করেন। হ্যাঁ, আন্দামান জেলে বছরের পর বছর তীব্র অত্যাচারের মধ্যে কাটাবার পর ইংরেজ শাসকের কাছে তাঁর ছাড়া পাওয়ার আবেদনপত্রটি চলে আসে কেন্দ্রবিন্দুতে। অথচ রামজন্মভূমির অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এই বুদ্ধিজীবীরা প্রথমে এলাহাবাদ উচ্চ আদালত ও সবশেষে সর্বোচ্চ আদালতে তাদের দাখিল করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস বাতিল ও নাস্তানাবুদ হওয়ার পরও তাঁরা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো যথার্থ বিশ্লেষণ বা অনুশোচনা ব্যক্ত করেননি। এরই বিপরীতে তথাকথিত দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা অজস্র বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলির প্রতি। এর মধ্যে অকাট্য প্রমাণ দিয়ে ভারতে আর্য আগমনের তত্ত্বকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রভু ইংরেজের লেখা ভারত ইতিহাসের বিতর্কিত ব্যাখ্যাগুলিকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। এই ব্যাখ্যাগুলি সবই বামপন্থী ইতিহাসবিদদের রচনা, অবশ্যই ইংরেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী। এই সূত্রে অতি সাম্প্রতিক দুটি বই একটি জে সাইদীপকের লেখা ও আরেকটি এমআর বেঙ্কটেসের লেখার কথা উল্লেখ্য। প্রথমটিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলা হয়েছে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের মানদণ্ডে ভারত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করা হবে কেন? দ্বিতীয়টিতে অর্থনীতি ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বাইরে রেখে মূল্যায়ন করা হয় তার ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা কতটা?

বাম ইতিহাসবিদদের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়া ও প্রায় অজ্ঞ ঐতিহাসিকের শিরোপা পাওয়া তথাকথিত দক্ষিণপন্থী (সত্য-পন্থী) ইতিহাস চর্চাকাররা উলটে এখনও সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক প্রামাণিক ভাবনা চিন্তার অবদান রাখার ক্ষমতাধারী। এই সমস্ত পরিত্যক্ত ইতিহাসবিদরা বাম উদারবাদী এলিটদের মতো নির্দিষ্ট তোষণনীতি ও স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী নয়। মরচে ধরে যাওয়া ধ্যানধারণার চর্বিতচর্বণের ফলে এই বাম-উদারবাদীরা আজ pamphlet বিলি করে মতামত জানাবার পর্যায়ে নেমে এসে মার্কামারা হয়ে উঠেছেন।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোকসংবাদ

দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৮ ডিসেম্বর একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেন কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অরুণ ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা, জামাতা ও ১ নাতনি রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সংস্কার ভারতী ও বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাস্তব পরিস্থিতিই হিন্দুদের রক্তাক্ত ইতিহাস মনে করিয়েছে

বিশ্বামিত্র

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রশ্ন তুলেছেন, কলকাতাকে কি পাকিস্তানে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে? তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, একদা রাজ্যের এক মন্ত্রী কলকাতাকে 'মিনি পাকিস্তান' আখ্যা দিয়েছিলেন। কলকাতার 'জনবিন্যাসগত পরিবর্তন' নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। আর তাঁর এই সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। রাজ্যের শাসক দল তো বটেই, সেকুলারবাদীরাও হাঁ হাঁ করে উঠেছে। 'সেকুলার সংবাদমাধ্যম'ও নাগাড়ে প্রচার করে চলছে, ভোটের মুখে এইসব কথা বলে বিজেপি নাকি মেরুকরণের রাজনীতি করতে চাইছে। কারণ মেরুকরণ না করলে নাকি বিজেপির কপালে একটি ভোটও জুটবে না। ভোটে উন্নয়নের কথা আনতে বিজেপি নাকি ভয় পায় ইত্যাদি কথাও বলা হচ্ছে! এঁদের উদ্দেশে সবিনয়ে জিজ্ঞাস্য, এবারের কলকাতা পৌরনির্বাচনে সবচেয়ে বড়ো ইস্যু এটাই কি হওয়া উচিত ছিল না যে সময়মতো কেন কলকাতা-সহ রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় নির্বাচন করাতে ব্যর্থ হয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বকলমে রাজ্য প্রশাসন? কেন প্রশাসক দিয়ে এতদিন পুরসভা চালিয়ে পুর-পরিষেবা শিকেয় তোলা হলো? কোভিডের অজুহাত দিলে বলতে হয়, গত বছর এই সময় তো কোভিড সিচুয়েশন রীতিমতো নিয়ন্ত্রণে, তখন কেন পুর-নির্বাচন হলো না? কারণ কি এটাই, যে বিধানসভা ভোটের আগে পুরনির্বাচনের ঝুঁকি রাজ্য সরকার নিতে চায়নি। পাছে পুরনির্বাচনে ভরাডুবি হলে তার রেশ পড়ে বিধানসভা-নির্বাচনেও। কিন্তু এখন তো একথা বলা যাবে না, তাতে শাসক দল রুষ্ট হবে। তাই তাদের তুষ্ট করতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুললে তাকে 'ভোটের রাজনীতি', 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' ইত্যাদি বলে ছাপ মেরে দলীয় রাজনীতির অঙ্গীভূত করে বিষয়টি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার সুচতুর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, বিষয়টি আদৌ তৃণমূল-বিজেপি ইত্যাদি দলীয় রাজনীতির বিষয়ই নয়।

আপনাদের মনে থাকতে পারে, বছর কয়েক আগে একটি হিন্দু বালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছিল কলকাতার একটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়। অভিযোগ পেয়েও বেশ কয়েকদিন সেখানে পুলিশ প্রবেশ করতে পারেনি। এটা কোন সভ্য জগতের চিহ্ন? কলকাতার মুসলমান-বহুল এলাকা, যেমন রাজাবাজার- এন্টালি-পার্ক সার্কাস, মেটিয়াবুরুজ-খিদিরপুর ইত্যাদি জায়গায় পাকিস্তানের জয়ের আনন্দে পাশবিক আনন্দে এমনকী কিছুদিন আগেও যখন নরক গুলজার করা হয়েছিল, তখন আশপাশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা কেমন আতঙ্কে রাতটুকু পার করেছিলেন, তার খবর নিয়েছিল কোন সংবাদমাধ্যম? স্বাধীন সার্বভৌম দেশে যা খুশি তাই করতে পারার এই অধিকার কি সংবিধান-স্বীকৃত? আসলে এই প্রশ্নগুলো যখনই সামনে আসে, তখনই একটা পক্ষ রীতিমতো ভীত হয়ে পড়ে। কারণ সেকুলারিজমের সযত্নে বানানো ভিত ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। কলকাতা নাকি মিলনের শহর, সব ধর্মের মানুষ এখানে মিলেমিশে থাকতে পারেন, নাকি মন্দির-মসজিদ-গির্জায় চিরকাল একসঙ্গে প্রার্থনা হয়েছে। সেকুলারিজমের এমন চমৎকার পরিবেশের মধ্যে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট একশন ডে'-তে যখন হিন্দু-নিধন চলছিল, তখন ক'জন মুসলমান তাঁদের 'হিন্দুভাই'দের রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল? বরং যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাম-চক্রান্তে সেই আমলে চরম সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য হয়েছেন এবং যাদের মদতে হিন্দুদের কচুকাটা করা হয়েছিল সেই হুসেন শাহ সোহরাওয়ার্দি, মুজিবুর রহমানকে জাতীয় নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কলকাতায় তাঁদের নামে রাস্তা পর্যন্ত হয়েছে। মুসলমানের হাতে হিন্দুর এই রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রশ্ন তুললে যদি কেউ বলেন, অতীত আঁকড়ে পড়ে থেকে লাভ কি? তবে বলি, অতীত থেকেই শিক্ষা নিতে হয়, নইলে একই ভুল বারবার হবে। আর বারংবার ভুলের খেসারত হিন্দুদেরই দিতে হবে, এটাই যেন নিয়তি।

রাজ্য এবং কলকাতার পুর-পরিষেবার হাল কি সকলেই জানেন, এমনকী শাসক দলও জানে। যে কারণে শাসক বিরোধী ভোটদানের প্রবণতা বা 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' রোধ করার জন্য তৃণমূল অনিল বিশ্বাসের নীতি নিয়েছে, কলকাতা পুর-নির্বাচনে প্রায় চল্লিশ শতাংশ প্রার্থী বদল করে। রুটি-কাপড়া-মকানের মতো মানুষের প্রাথমিক চাহিদাটুকু ভোটে অবশ্যই ইস্যু হোক, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এখানে সম্প্রীতি রক্ষার যে ডাক দেওয়া হয় তা নেহাতই একচেটিয়া হিন্দুদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। হিন্দুরা যখনই আত্ম-সচেতন হয়ে ওঠেন তখনই কমিউনিস্টরা 'ভাত দে' রবে আর্তনাদ করে ওঠেন। কারণ পেটের খিদে নিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারলে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নটিকেই গুরুত্বহীন করে দেওয়া সম্ভব হবে। যেটা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক কৌশলের অঙ্গ যে, কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখতে মানুষকে পেটের ভাত নিয়ে ভুলিয়ে রাখো। আজ এরাজ্যে পোশাকি কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসান হয়েছে বটে, তবে তাদের মানসিকতাটা থেকে গেছে। আজ কলকাতা পুরসভার ৫৫-৬০টা মতো ওয়ার্ডে মুসলমানরা ডিসাডিং ফ্যাক্টর। আর তাতেই কলকাতার সর্বাপেক্ষা অতি-গুরুত্বপূর্ণ পুর-প্রশাসনিক একাধিক পদ তাদের দখলে। যেদিন ১০০টা ওয়ার্ড এই জায়গায় পৌঁছবে সেদিন কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুর ভাগ্যে আরও একটা ১৯৪৬ অপেক্ষা করে থাকবে, একথাটাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। আর এতেই এত গাদ্রদাহ। ▯

অন্য বড়দিনে অনন্য অমৃতের পুত্ররা

কলকাতার বড়দিন মানেই পার্কস্ট্রিট, বো ব্যারাক, সাহেব পাড়ায় দেদার খানা-পিনার সমারোহে। নিতান্ত উদ্দাম চটুল যাপন। অথচ ১৩৩ বছর আগে একই বড়দিনের প্রাক্কালে ন'জন তরুণ মহৎ উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন নির্বাণের পথ। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অভেদানন্দের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীর আবির্ভাবক্ষণ চিহ্নিত হয়েছিল এই বাঙ্গলায় খ্রিস্টীয় উৎসবের পুণ্য লগ্নে।

নিখিল চিত্রকর

২৫ ডিসেম্বরের আগের রাত। হুগলি জেলার আঁটপুর। বাঙ্গলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের খোলা আকাশের নীচে, কনকনে ঠাণ্ডায় জ্বলছে ধুনি। ধুনির পবিত্র আগুনের ছোঁয়াচ নিয়ে নতুন জীবনের শপথ নিচ্ছেন ৯ জন যুবক। নরেন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা। অধ্যাত্মবাদের ফল্গুধারায়। ন'টি জ্বলন্ত নক্ষত্র ভারতব্যাপী পরিচিত হবেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ পরিচয়ে।

সেদিন শ্রাবণ সংক্রান্তি। ঝুলন পূর্ণিমা। সাল ১৮৮৬। ইংরেজির ১৬ আগস্ট রাত ১ টায় তিনবার মা-কালীর নাম উচ্চারণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তারপর সমাধিস্থ হলেন। সে ছিল অনন্ত সমাধি। সকালে কাশীপুর শ্মশানে দাহ করা হলো ঠাকুরের ইহলৌকিক দেহ। তারপর থেকে মূলত আর্থিক অসঙ্গতির জন্যই ঠাকুরের ভাবশিষ্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন চারদিকে। বেদান্ত ভাবধারা প্রসারের অঙ্গীকার গেল থমকে।

বুড়ো গোপাল, কালীপ্রসাদ, তারকের মতো ত্যাগী ভক্তরা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। বাকিরা যে যাঁর বাড়িতে ফিরে পড়াশোনায় মন দিলেন। চোখের সামনে যাঁরা ঠাকুরের ত্যাগব্রতের জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের পক্ষে ফের 'কামিনী-কাঞ্চন' বেষ্টিত জীবনে ফিরে যাওয়া সহজ ছিল না। নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, বাবুরাম, শশী, শরৎ, কালী, যোগেন, সারদা, সুবোধ ও লাটুরা জানতেন, ও পথ তাদের জন্য নয়। সঙ্ঘ গড়ে তুলতে হবে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে হবে, তবেই ঠাকুরের ভাবনাগুলো একটা নির্দিষ্ট আধার পাবে। ছেঁড়াখোঁড়া ভাবনার ঢেউগুলো

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে বিরাজ করেছেন। তাঁর বাণী ও বেদান্ত ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাঙ্গলার এই নয় নবীন সেদিন পাকাপাকিভাবে সন্ন্যাসপথে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে তাঁদের জীবন প্লাবিত হবে

বিচ্ছিন্নভাবে উঠছিল আর নামছিল, কিন্তু কিছুতেই দানা বাঁধছিল না।

ঠাকুরের সেই ভাবনার প্রসারের প্রথম বুনিয়াদ রচিত হলো আঁটপুরে, বাবুরাম অর্থাৎ পরবর্তীকালের স্বামী প্রেমানন্দের গ্রামের বাড়িতে। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সন্ধিক্ষণে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যদের জীবনে এই বড়দিনের অদ্ভুত তাৎপর্য রয়েছে।

ঠাকুরের পরলোক গমনের এক বছর পর বরানগর মঠে বসে সতীর্থদের গল্প শোনাচ্ছিলেন নরেন। তখনও তিনি বিবেকানন্দ হননি। ১৮৭৪ সাল নাগাদ একদিন যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন ঠাকুর। সাহেবি শৌখিনতা দিয়ে সাজানো বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল দেয়ালে টাঙানো একটি তৈলচিত্রে। শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে মা মেরির ছবি। ছবিটি দেখেই ভাবসমাধি হলো ঠাকুরের। যদু মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরেও নাকি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি কাটেনি। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেও গেলেন না তিনি। একমনে একদিন পঞ্চবটী বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ এক গৌরকান্তি পুরুষমূর্তির দেখা পেলেন। সেই পুরুষ ক্রমশ ঠাকুরের দিকে এগিয়ে এল। রামকৃষ্ণদেব তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করতে গিয়ে দেখেন মূর্তি অদৃশ্য। এরপরেই তিনি জ্ঞান হারান। ভক্তরা মনে করতেন, সেদিন তাঁর শরীরেই বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'যত মত তত পথ'-এর বাণী নিজের জীবন দিয়ে পালন করে গিয়েছেন। আর সেই জীবনে সেদিন যুক্ত হয়েছিল আরও একটি মাত্রা। নানা লেখাতে স্বামীজীও উল্লেখ করেছেন, বেদান্ত দর্শনের বাইরে যাঁদের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগে ভাসতেন, তাঁদের একজন যিশুখ্রিস্ট। স্বামীজীর সেদিনের সেই আবেগঘন বর্ণনার শেষে সবাই খেয়াল করেন, দিনটি ২৪ ডিসেম্বর। সেই রাতেই সমস্ত প্রস্তুতি সারা হলো। পরদিন মঠেই পালিত হলো যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব। এভাবেই রামকৃষ্ণ মিশনে বড়দিনের সূচনা। সেই দিনটির কথা মাথায় রেখে আজও প্রতিটি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বড়দিনের সন্ধ্যায় উৎসবে মেতে ওঠেন সন্ন্যাসীরা। ক্যারলের সুরে কেক কেটে উদ্‌যাপন হয় যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন।

সেবার বাবুরামের মা মাতঙ্গিনী দেবী বড়দিনের ছুটিতে ছেলের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করলেন। বললেন, ছুটিতে সবাই যেন তাঁদের বাড়িতে আসে। বাবুরাম তখন কলকাতায়। প্রথমে ঠিক ছিল, বাবুরাম আর নরেনই যাবেন। কিন্তু পরে ইচ্ছুক অতিথির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। নরেন, বাবুরামের সঙ্গে জুটে গেল শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা। সঙ্গে তানপুরা, তবলা, বাঁয়া। হাওড়া থেকে তারকেশ্বরের ট্রেনে উঠলেন 'নবরত্ন'। ট্রেন ছাড়তেই শুরু হলো গান। 'শিবশঙ্কর ব্যোম ব্যোম ভোলা', 'ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন'। নরেনের নেতৃত্বে সবাই সঙ্গত করলেন। ট্রেন হরিপাল স্টেশনে এসে থামল। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আট কিলোমিটার পথ। গোধূলির সন্ধিক্ষণে মাতঙ্গিনী দেবী দেখলেন হইহই করতে করতে ছেলের দল হাজির। খাবার-শোওয়ার বন্দোবস্ত করতে করতে রাত নেমে এল। পরদিন ২৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার। ঠিক হলো রাতে ধুনি জ্বালিয়ে জপ-ধ্যান করবেন সবাই। কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ধ্যানের অভ্যাস নরেনের ভালো মতোই ছিল। একদিন গিরিশ ঘোষ আর নরেন ধ্যানে বসেছেন। মশার কামড়ে গিরিশের ধ্যান ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলেন, নরেনের পুরো শরীর মশায় ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু নরেন এতই একাগ্রচিত্ত ও ধ্যানমগ্ন যে বার বার ডেকেও তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না। গিরিশ একটু ধাক্কা দিলেন। নরেনের অচৈতন্য শরীর পড়ে গেল।

সেই নরেন গুরুভাইদের সঙ্গে ধ্যানে বসেছেন ধুনি জ্বালিয়ে। কনকনে শীতের রাত। আকাশভরা তারা। এক সময় ধ্যান ভেঙে গেল। যিশুখ্রিস্টের কথা বলতে শুরু করলেন নরেন। 'যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন বহুদিন। রোমান নাগরিক সল ঘোড়ায় চেপে চলেছেন দামাস্কাসের পথে। তুরস্কের তরসাসে এক ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম। যিশুকে নিয়ে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। আচমকা মাটিতে পড়ে গেলেন সল। শুনলেন কেউ যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে আর বলছে, 'সল, আমায় কেন তোমরা ক্রুশে বিদ্ধ করলে, আমি ভীষণ আহত'। সল বললেন, 'প্রভু, কে তুমি?'

উত্তর এল, আমি যিশু, যাকে তোমরা হত্যা করেছিলে। ঘটনার পর তিনদিন চোখে দেখতে পাননি সল। হাতড়ে হাতড়ে পথ চিনে পৌঁছেছিলেন দামাস্কাসে। সেই থেকে বদলে গেলেন সল। কাঁধে তুলে নিলেন খ্রিস্ট ধর্মের ক্রুশ। হয়ে উঠলেন সন্ত পল। খ্রিস্ট ধর্মের পতাকাবাহক।'

সন্ত পলের মতোই সেদিন ধুনির আগুনকে সাক্ষী রেখে ন'জন অমৃতের পুত্র শপথ নিয়েছিলেন, আর ঘরমুখো হবেন না তাঁরা। সন্ন্যাস নেবেন। বরানগরের মঠই হবে তাঁদের নয়া ঠিকানা। সব্বাই জোট বেঁধে থাকবেন। একসঙ্গে। একমন্ত্রে। অভিন্ন চৈতন্যের প্রজ্ঞায়। স্মৃতিচারণায় স্বামী শিবানন্দ লিখেছেন, 'ঠাকুর তো আমাদের সন্ন্যাসী করেই দিয়েছিলেন, ওই ভাব আরও পাকা হলো আঁটপুরে।'

কলকাতার বড়দিন মানেই পার্কস্ট্রিট, বো ব্যারাক, সাহেব পাড়ায় দেদার খানা-পিনার সমারোহে। নিতান্ত উদ্দাম চটুল যাপন। অথচ ১৩৩ বছর আগে একই বড়দিনের প্রাক্কালে ন'জন তরুণ মহৎ উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন নির্বাণের পথ। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অভেদানন্দের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীর আবির্ভাবক্ষণ চিহ্নিত হয়েছিল এই বাঙ্গলায় খ্রিস্টীয় উৎসবের পুণ্য লগ্নে।

With Best Compliments

from :

A
WELL
WISHER

ভারতের জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশদের অবদান—নিছক ভ্রান্ত ধারণা

পুলকনারায়ণ ধর

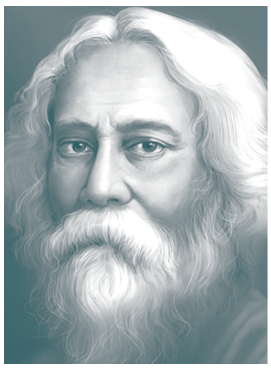

জাতি ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাশ্চাত্যের ভাবনায় গড়া। পশ্চিমি শিক্ষার ছাঁচে আমরা ভারতের জাতীয়তা ভাবনাকে পুষ্ট করেছি। ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আসার পর আমাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আলোকে আইনের শাসন ও ইংরেজিয়ানা আমাদের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে। আমাদের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হলো, ব্রিটিশরা সভ্য জাতি ও ভারতীয়রা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত জাতি। এই ধারণা ব্রিটিশরা খুব যত্ন করে আমাদের শিখিয়েছে। ব্রিটিশরা আসার আগে সুলতানি ও মোগল শাসনের বা নবাবি আমলের চরম নৈরাজ্য ও বিধর্মী আচরণ সাধারণ হিন্দু মানসে যে নিপীড়ন চালিয়েছিল তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাভাবিক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা সাহেবি যুগের সূচনায় তাই হিন্দু বাঙ্গালিরা একে সাদরে মেনে নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্ন তখন ছিল অনেক দূরের। ইসলামি শাসনের নৈরাজ্য কাটাতে ব্রিটিশরাই যে বড়ো সহায়ক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না শিক্ষিতদের মনে। সে যুগের সর্বাগ্রগণ্য শিক্ষিত মানুষ 'ভারত পথিক' রাজা রামমোহন রায় তাই ব্রিটিশদের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে বর্ণনা করেছিলেন, 'Benediction of God of Earth' বলে। এ কথা ঠিক, ব্রিটিশরা একটা নিয়মের মধ্যে বা আইনের গণ্ডিতে মানুষের চলাচলকে স্বাভাবিক গতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ইসলামের আগ্রাসী শাসন ও ধর্মান্তরিত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা ছিল বাধা। কিন্তু তাদেরও ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ভারতকে খ্রিস্টান বানানোর অভিসন্ধি। ১৮৩৫ সালে টমাস মেকওলে (Thomas Macaulay) যে 'প্রেসক্রিপশন' দিয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পরের ব্রিটিশ শাসকরা এ দেশে প্রয়োগ করেছে। মেকওলে দেশের সাধারণ মানুষের নৈতিক শক্তিটাকে ধ্বংস করে তার ওপর ব্রিটিশ প্রভুর শিক্ষা ও স্বার্থসর্বস্ব ধারণার প্রসার ঘটানোর 'ফর্মুলা' দিয়েছিলেন।

ভারতবাসীর দেহটা রইল দেশীয়, কিন্তু মানসিকভাবে তারা বদলে হলো শাসকের আজ্ঞাবহ ও তার আদর্শের স্তুতিকার। শিক্ষিত শ্রেণী রাতারাতি ব্রিটিশদের অনুকরণে তাদের আদবকায়দা ও ভাব রপ্ত করতে গিয়ে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা আটকে পড়লেন কৃত্রিমতার আবরণে। ব্রিটিশদের কেরানি বানানোর কলে পড়ে আমাদের দেশ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ভাবনাগুলি পালটে গেল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশদের শেখানো বুলিতেই আমাদের ইতিহাস চর্চা ও জাতীয়তার সংজ্ঞা নিরূপিত হলো। সেই ধারণার বশে আমাদের রাজনীতি, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বর্তমান স্বাধীন ভারতের সব ধরনের অবক্ষয় হলো। আজকের যে দিশাহীন অবস্থা, তা কিন্তু ব্রিটিশদের সাজানো শরশয্যায় শায়িত ভ্রান্ত শিক্ষারই ফল। এই শিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষা নয়। প্রশ্ন এখন, জাতি কাকে বলব? এই জাতীয়তাবোধ কি সব কালে সব দেশে একই রকমের? জাতি গড়ার মৌলিক উপাদান কী? তা কি সব দেশ ও সমাজে একই চরিত্রের? আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয়তার উদ্ভব কীভাবে ও কোন ভাবকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এটাই মৌলিক জিজ্ঞাসা। এই জাতীয়তাবোধ কি ব্রিটিশদের দান? তার আগে কি আমাদের জাতি বলে কোনো পরিচয় ছিল না? আমরা কি জলে ভাসমান পরিচয়হীন চিহ্নহীন শৈবাল দামের মতো ছিলাম? একেবারেই নয়। ব্রিটিশরা না এলেও আমাদের জাতীয়তা তার নিজস্ব পথরেখা ধরেই গড়ে উঠত।

হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলে ছিল ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা। প্রত্যেক জাতির এক বিশেষ আদর্শ আছে। সেই আদর্শই সেই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'কাহারও মধ্যে রাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা সামাজিক উৎকর্ষ, আবার কাহারও মধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ,... আমাদের জন্মভূমি আশ্রয় করিয়াছেন পরমার্থকে, যে পরমার্থই তাহার আধার, যে পরমার্থই তাহার মেরুদণ্ড, যে পরমার্থরূপ পাষাণ ভিত্তির উপরই তাহার বিশাল জীবনপ্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে।... একথা পরিষ্কাররূপে স্বীকার্য যে, ভালোর জন্যই বলো বা মন্দর জন্যই বলো, আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের ধর্মের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্তন করিতে পার না; ইহার পরিবর্তে, ইহাকে নষ্ট করিয়া, প্রাণশক্তির জন্য অপর আশ্রয় স্বীকার করিতে পার না।' এটি আমাদের জীবনখাত তৈরি করে দিয়েছে। এই খাতটিকে জোর করে বিদেশি শিক্ষা ও শাসন—ইসলাম ও খ্রিস্টান—অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। এ যেন ভাগীরথীকে ঠেলে

হিমালয়ের তুষার গর্ভে ফেরত পাঠানোর প্রচেষ্টা।

রাজনৈতিক বা অন্যভাবে এই চেষ্টা এক হাজারেরও বেশি বছর ধরে চলেছে। তৈরি হয়েছে দরকচা মার্কা জাতীয়তাবাদ ও কৃতদাসত্ব। স্বামী বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, 'ইউরোপে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা নেশন সংহতি গঠিত হয়, প্রাচ্যে ধর্মের আদর্শ নেশন সংহতি গঠন করে। অতএব সর্বাগ্রে ধর্মাদর্শের সমন্বয়ের ওপর ভারতের ভাবী কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।' সব কালের ধর্ম সমন্বয়ের শক্তিই আমাদের নেশনের প্রথম বিশেষত্ব। স্বামীজী বলেছেন, 'যেদিন এই সামর্থ্য লোপ পাইবে, সেদিন উহার মৃত্যু অবধারিত।' ইসলামি শাসনে ভারতে যে যুগের সূচনা হয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘর্ষ পর্যন্ত যে যুগ, তা ভারতবর্ষের এক টালমাটাল যুগ। ধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন অভাবের সূচনা হয় ও সমাজ জীবনে আসে নৈরাজ্য। এই অবস্থার মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এক নতুন সমীকরণের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম ধর্মমত প্রচার করলেন। কিছু ইংরেজি শিক্ষিত 'এলিট'দের মধ্যে সীমিত এই ধর্মসভা শেষ পর্যন্ত একটি 'সাধারণ ইন্টেলেকচ্যুয়াল ক্লাবে' পরিণত হয়েছিল। জাতি গড়ার কোনো কাজেই তা আসেনি। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু তা চাননি। রাজা রামমোহন রায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বিচার করেছেন তাও আমরা বুঝিনি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয়নি।...ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে দায়মুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। রামমোহন রায় ক্ষুদ্র পরিধিতে বদ্ধ ছিলেন না। 'ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যে রূপ ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশিরা কখনোই তাঁহাকে ঠিক সে রূপ ভাবে বুঝে না।...ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন... আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী' (রবীন্দ্রনাথ)। এই ভাবনা থেকে রামমোহন বিচ্যুত ছিলেন না। তাই তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সাহস করে কথাটি বলেছিলেন, 'রামমোহন রায় সব হিন্দু সমাজকে উচ্চেই তুলিয়াছেন'। ব্রাহ্মরা হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনের মধ্যেই ডুবে ছিলেন। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মূল ধর্মকে সংস্কার করছেন মনে করে মূল থেকে বিচ্যুত রয়েছেন।

তাই জাতীয়তার বাণী অধরাই থেকে গেছে। আমাদের দেশের সমাজে ও ধর্মে যে মূল সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিক্ষুব্ধ ইতিহাস তাঁদের ভাবনায় স্থান পায়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'মধ্যযুগে মুসলমানরা বাইরে থেকে এসে এক সংঘাতের সূচনা করেছিল। এই সংঘাতে 'দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্য দান করেনি, বরং তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করার মাধ্যমে বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতম ঐক্যকে উপলব্ধি করেনি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মানুষের বাহ্য রূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল।'

অন্যদিকে, বাইরের এই ঝড়কে সামাল দেওয়ার জন্য হিন্দু সমাজ তার চারদিকে নানাবিধ নিষেধের প্রাচীর তুলে দিল। যে বিরোধ সেদিন শুরু হয়েছিল, তা আজও মিটতে চায় না। সে বিরোধের চরম রাজনৈতিক পরিণতি ঘটল ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের ঘটনায়। তাই ভারতের জাতীয়তাবোধের ভাবনা কোথায় শুরু ও কী তার পরিণতি এবং কোন পরম্পরায় আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ভাবনা তার বিচার করার সময় এসেছে। জাতীয়তাবাদের পাল্কিবাহকরা বুঝতে ব্যর্থ হলেন ইতিহাসের এই কঠিন বাস্তবকে। তাই তাঁরা সহজ পথ হসেবে ব্রিটিশ বিদ্বেষের ভূমিতে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন। একটি নেতিবাচক কাঠামো তৈরি হলো। এতে ধূমায়িত ক্ষোভ উদ্‌গীরিত হয়— কিন্তু জাতি সম্পর্কে আমাদের আত্মার উদ্বোধন ঘটে না। ফলে তীব্র নেতিবাচক আত্মস্ফীতিকেই জাতীয়তা বলে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাল। যার স্রোতে সৃষ্টি হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ।

ব্রিটিশদের দাসত্ব কাটানোই একমাত্র লক্ষ্য, এটাই আমাদের ধারণা হলো। মেকওলের যে শিক্ষা আমাদের দেহাভ্যন্তরে বা রক্তে বিজাতীয় পাশ্চাত্য ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জাতিকে নির্জীব করেছে এবং সনাতন ধর্ম ও সত্যবোধকে আচ্ছন্ন করেছে, তা অপনোদনের কোনো পরিকল্পনা ও প্রচার জাতীয়তাবাদী নেতারা করলেনই না। তাঁরা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিলেন। আর পাঁচটা নেশনের মতো আমরা শুধু ঐহিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্রিটিশদের তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের স্বরূপ কী তা না বুঝেই শুধু ক্ষমতা লাভ করতে সচেষ্ট হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা দু'দিনেই এনে দিতে পারি। কিন্তু সে স্বাধীনতা কি তোমরা ধরে রাখতে পারবে?' অর্থাৎ স্বাধীনতার যোগ্য না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা অধরা থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে কালের উপযোগী করে তোলাই ছিল প্রধান কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ এই জাতীয়তাবোধেরই ঋষি ছিলেন। এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার লক্ষ্যেই স্বামীজীর ডাক ছিল 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। ভগিনী নিবেদিতা এই ভারতীয় সভ্যতারই পূজারি ছিলেন। তাঁর বৈপ্লবিক সংগঠনের সঙ্গে ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণও ছিল এই আদর্শ ধারাকে মূর্ত করে তোলা ও বিপ্লবীদের মানসে এই দেশপ্রেমের সঞ্চার করা। এই জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশদের তৈরি ম্যাঞ্চেস্টারের কলে নির্মিত জাতীয়তাবাদ নয়, শুধু জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয়তা গড়ে উঠবে না।

ব্রিটিশরা এক ঐক্যবদ্ধ যান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলায় গোটা দেশকে বেঁধে দিল। এর পেছনে ছিল তার বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন ও পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ঐক্যবদ্ধ দেশের রূপ ছিল বাহ্যিক। ব্রিটিশ শাসন চলে যেতেই তার পলেস্তারা খসে পড়তে শুরু করেছে। 'ওয়েস্ট মিনিস্টারের' রাজনীতি ভারতের মূল ভাবটি স্পষ্ট করে দিয়েছে। আধুনিক ভারতের যাবতীয় অনৈক্যের সমস্যা এই ভ্রান্ত আত্মঘাতী জাতীয়তার ফল।

মনে রাখতে হবে, জাতীয় ঐক্য আর জাতীয়তা এক বস্তু নয়। জাতীয়তাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে জাতীয় ঐক্য বার বার ব্যাহত হবে। ক্রমশ রাজনৈতিক শক্তি আমাদের গ্রাস করবে। এই তমসাবৃত মিথ্যাবোধ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় জাতিকে স্বভাবনায় আবার স্থাপন করা। *(সংক্ষেপিত)*

মিজোরাম : জেলা থেকে রাজ্য

জহরলাল পাল

অসমের প্রতিবেশী ছোটো রাজ্য মিজোরাম। রাজ্যটি অসমের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। যার ভৌগোলিক আয়তন ২১,০৮১ বর্গকিলোমিটার। অসমের সঙ্গে মিজোরামের সীমান্ত দৈর্ঘ্য ১৬৫ কিলোমিটার। স্বাধীনতার সময় কালে মিজোরাম (প্রাক্তন নাম লুসাই পাহাড়) একটি জেলারূপে অসমের সঙ্গেযুক্ত হয়। পরবর্তীতে জেলাটি রাজ্যের মর্যাদা পায়, যেখানে বর্তমানে এই রাজ্যের জেলার সংখ্যা ৮। জেলা থেকে রাজ্যে উত্তরণের সময়টি ছিল মিজোরামবাসীদের জন্য এক কঠিন সংগ্রামের অধ্যায়। বর্তমানে রাজ্যের বাসিন্দারা তাদের যে মিজো বলছে সেটা হচ্ছে তাদের নতুন নামকরণ। তাদের ভাষায় মিজো মানে হচ্ছে যারা উঁচুতে বাস করে লুসাই, কুকি, মহার, পাইতো, রিয়াং, পাওয়াই, চাকমা, লাখের প্রভৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত নাম হলো মিজো।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা ছিল লুসাই, চীনা ও কাচিন এই তিন জনগোষ্ঠী। তারা সুদূর চীন সীমান্ত থেকে ক্রমে ক্রমে গভীর জঙ্গলের মধ্যপথ ধরে এগিয়ে বার্মা (মায়ানমার) হয়ে এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। তাদের বংশধররাই ক্রমে ক্রমে বংশবিস্তার করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো গোষ্ঠীই একে অন্যকে মেনে নিতে পারত না। নিত্য সংঘর্ষ, হত্যা, উৎখাত তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। গোষ্ঠী প্রধানকে বলা হতো লাল। তবে অধীনস্থ স্থানকে বলা হতো পুঞ্জি। লালরা শত্রুর মস্তক ছেদন ও সংগ্রহ করে গৌরবের অধিকারী হতো। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্ষমতার বিস্তার, খাদ্য-বস্তু প্রভৃতির প্রয়োজনে লালরা অরণ্যের দুর্গম অঞ্চল থেকে ক্রমশ মণিপুর, কাছাড় এবং ত্রিপুরা প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে ওদের পুঞ্জির বিস্তার ঘটাতে থাকে। চলতে থাকে সীমান্তবাসীদের ওপর অত্যাচার, লুটপাট। অগ্নিসংযোগ-সহ হত্যালীলা, মুণ্ডচ্ছেদন ইত্যাদি। ক্ষমতাশীল ব্রিটিশরাজ তখন কাছাড়ের অধীশ্বর। তখন কাছাড়ের সুপারিন্টেনডেন্টরা ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ১৮৬৭ সাল থেকে

ডিসিরা জেলার দায়িত্বে থাকতেন। সর্বশেষ সুপারিন্টেনডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন রবার্ট স্টেওয়ার্ট (১৮৫৭-৬৭), পরে তিনিই জেলাধিপতি হন। প্রাণপাত চেষ্টার পরও জেলাধিপতিরা লালদের আক্রমণ তথা অত্যাচার প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। লুসাই-কুকিদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে কাছাড় জেলার দিক থেকে জেনারেল বৌচার ও চট্টগ্রামের দিক থেকে আর একটি দল জেনারেল ব্রোউনলো-র নেতৃত্বে লুসাই পাহাড়ের দিকে রওনা হয়েছিল। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরও লালদিগকে শায়েস্তা করা গেল না। তখন ঠিক হয় সেখানে সামরিক কর্তা ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে সেখানকার অবস্থা শান্ত করতে চেষ্টা করা হবে। কিন্তু পুঞ্জির লালদিগকে বশে আনা গেল না।

এই সময়ে ইংল্যান্ডের লর্ড বংশজাত ইউলিক ব্রাউনির ছেলে হারবার্ট আর ব্রাউনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতে আসেন ব্রিটিশ আমলা সেজে। ব্রাউনি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ১৮৯০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে লুসাই পাহাড়ে ঝাপিয়ে পড়েন। কিন্তু আহত হয়ে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়। বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও ব্যর্থতার পর চতুর ব্রিটিশরা তাদের কর্মপদ্ধতি বদলে নিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ লুসাই অঞ্চলকে বহির্ভূত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে খ্রিস্টান মিশনারি ছাড়া অন্য কোনো বহিরাগতকে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ করে দেয়। পদ্ধতি সফল হয় এবং ব্রিটিশরাজ পাহাড়ে তার ক্ষমতা সহজভাবেই কায়েম করতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। স্কুল-কলেজ স্থাপন করে স্থানীয়দেরকে মিশনারিরা শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হয়। ফলে ক্রমে ক্রমে স্থানীয়রা ভুলে যায় ব্রিটিশ বিদ্বেষ। এক আদেশ বলে ১৮৯০ সাল থেকে লুসাই পাহাড়কে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়। স্থানীয় প্রধানদের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের শাসন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর অঞ্চলটি লুসাই পাহাড় জেলা নামে অসমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত লুসাই পাহাড় জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই করুণ। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অত্যাধিক নিম্নস্তরের। একমাত্র সড়কপথ শিলচর থেকে ধোয়ারবন্দ হয়ে সাইরেং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাতেও কেবল ছোটো ভারী গাড়িগুলিই চলতে সক্ষম হতো। অধিকাংশ সময় গাড়িগুলিকে চাকায় লোহার শিকল পরিয়ে উঠা-নামা করতে দেখা যেতো। ওই সময়কালে লুসাই পাহাড় জেলার একমাত্র মহকুমা শহর ছিল লুংলে। ব্যবসায়ী কেন্দ্র ডেমাগিরি (ত্লাবং)-এর সংযোগ ছিল নদীপথে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে। এমনকী এই সময়ে এইসব অঞ্চলে পাকিস্তানি মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় চলতো। ডেমাগিরি ও সাইরেং ছিল নদীপথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। নাব্য নদী দুটি ছিল জেলার পশ্চিমে কর্ণফুলী ও উত্তরদিক থেকে প্রবেশ করা ধলেশ্বরী। 'মৌটাম' নামক দুর্ভিক্ষ লুসাই পাহাড় জেলার জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি বিপদ সংকেত। যা প্রতি ৫০ বছর অন্তর উত্তর জেলায় আত্মপ্রকাশ করে। মৌটামের অর্থ হলো বাঁশের মৃত্যু। ৫০ বছরের এই সময় চক্রে জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন জেলাবাসীর জীবন চরম দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বাসিন্দাদের কৃষিজীবন চরম

দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। বাসিন্দারা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মৌটামকালে বাঁশ গাছে ফুল দেখা দেয় এবং জেলার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ইঁদুরের সংখ্যাধিক্য ও উৎপাত বাড়ে এবং ফসল নষ্ট করতে তৎপর হয়। লুসাই পাহাড় জেলায় 'মৌটাম' দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে স্বাধীনতার পর ষাটের দশকের প্রথমদিকে। অভাবগ্রস্ত জেলা, রাজ্য তথা দেশ থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, মৌটামের প্রাদুর্ভাবে জেলাবাসী অসহায়, সন্ত্রস্ত— তার ওপর তাদের মনে হলো তারা সর্ব্বোতভাবে উপেক্ষিত।

চারিদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। এরূপ অবস্থার মধ্যে এগিয়ে এলেন তেত্রিশ বছরের এক যুবক, নাম লালডেঙ্গা। জন্ম তার লুংলে জেলার এক গ্রামে ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে। তিনি তিন বছরের জন্য মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। জেলাবাসীকে সাহায্য করার জন্য তিনি 'মিজো ন্যাশনাল ফ্যামিন্ ফ্রন্ট' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এই সংগঠনের নাম বদল করে নাম দেওয়া হয় 'মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট' রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে। যার প্রতিষ্ঠা দিবস ২২ অক্টোবর ১৯৬১। তখন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিমলা প্রসাদ চালিহা।

বঞ্চনায় ফুঁসছিল লুসাই পাহাড় জেলা। পরিকল্পনা চলতে থাকলো বিদ্রোহ ঘোষণা করার। বাংলাদেশের তখনও জন্ম হয়নি। পাকিস্তান বিদ্রোহীদের প্রতি সদয় হয়ে উঠলো। বিদেশ থেকে চলল অস্ত্র সংগ্রহ। ১৯৬৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ১০-৩০ মিনিটে লালডেঙ্গা লুসাই পাহাড় জেলাকে মিজোরাম নাম দিয়ে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। তার এই আহ্বান ২৫ মার্চ ১৯৬৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে অসমর্থ হয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে ৫ মার্চ ভারতীয় বিমানবাহিনী আইজল শহরের আশে পাশে বোমা ফেলতে শুরু করে। প্রায় এক মাস কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর বিদ্রোহ প্রশমিত হতে বাধ্য হয়।

সাময়িকভাবে জেলায় শ্মশানের নীরবতা এলেও আগ্নেয়গিরির লাভা সুপ্তভাবে টগবগ করে ফুটছিল, তা বুঝে উঠতে কর্তৃপক্ষের অসুবিধা হয়নি। তাই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। এর অন্যতম উপায়টি ছিল পিপিভি (Protected and progressive Village)। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রধান সড়কের মধ্যে বিদ্রোহীদের আটকে রাখা। এখনও ভাইরেংটি থেকে আইজল হয়ে লুংলে যাওয়ার পথে এরূপ বৃহৎ আকারের গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। যারা পূর্বপুরুষের আমল থেকে বিভিন্ন পুঞ্জিতে বসবাস করতো তাদের সেইসব পুঞ্জি থেকে উচ্ছেদ করে পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু নির্বিচারে জোর করে পিপিভি-তে এনে জমা করা হতো। প্রত্যেকটি পিপিভি কঠোর সামরিক পাহারার মধ্যে থাকতো।

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি লুসাই পাহাড়কে মিজোরাম নামে পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সময়কালে ১৯৮৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মিজোরাম পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সংবিধানের ৫৩তম Constitutional Amendment Act, 1986-এর দ্বারা মিজোরামকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ওই সময় থেকেই অসমের সঙ্গে মিজোরামের সীমান্ত সমস্যা শুরু হয়। মিজোরামের তিন জেলা— আইজল, কলাশিক ও মামিত অসমের বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের সঙ্গে সীমা তৈরি করে। মিজোদের দাবি হলো ১৮৭৫-এর নোটিফিকেশনকে মান্যতা প্রদান করে সীমা বিবাদের নিস্পত্তি করতে হবে। এই নোটিফিকেশন নেওয়া হয়েছিল 'বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার নোটিফিকেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৩ থেকে। কিন্তু অসমের কথা হলো, ১৯৩৩ সালে যে ডিমার্কেশন করা হয়েছিল তা মানা উচিত। ওই সালের ডিমার্কেশনে লুসাই পাহাড়ের সঙ্গে অসমের সীমা তৈরি হয়। কিন্তু মিজেরামের বক্তব্য হলো, ১৯৩৩ সালের ডিমার্কেশনের সময় লুসাই পাহাড়ের লোকদের মতামত নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে তার থেকেও আরও বাস্তব সত্য হলো ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশরা কাছাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে নোটিফিকেশনের মান্যতা দিয়েছিল, তখন কিন্তু তারা এটাও জানতো না যে, লুসাই পাহাড়ের মাটির রং লাল না কালো, সেখানে বৃষ্টি হয় গ্রীষ্মে না শীতে। লুসাইদের বরাকভূমিতে ঢুকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করে সীমারেখাকে নোটিফিকেশনের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, লুসাই পাহাড়ের লালদের প্রকৃত অধিকারের জায়গাকে নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না।

বর্তমানে অসম-মিজোরাম সীমা বিবাদের সমাধান করতে কেন্দ্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। এই জন্য চাই স্থায়ী সমাধান সূত্র। এই স্থায়ী সমাধান সূত্রের প্রয়োজনে অসম-মিজোরামের মধ্যবর্তী ১৬৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমারেখার উপর বিস্তৃত একটি সড়ক তৈরি করে নিতে হবে, যা দুই রাজ্যকে সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে পৃথক করে রাখতে পারবে। স্থায়ী সমাধানে এটাই হবে সহজ উপায়, ফলে আশা করা যায় অসম-মিজোরামের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য। □

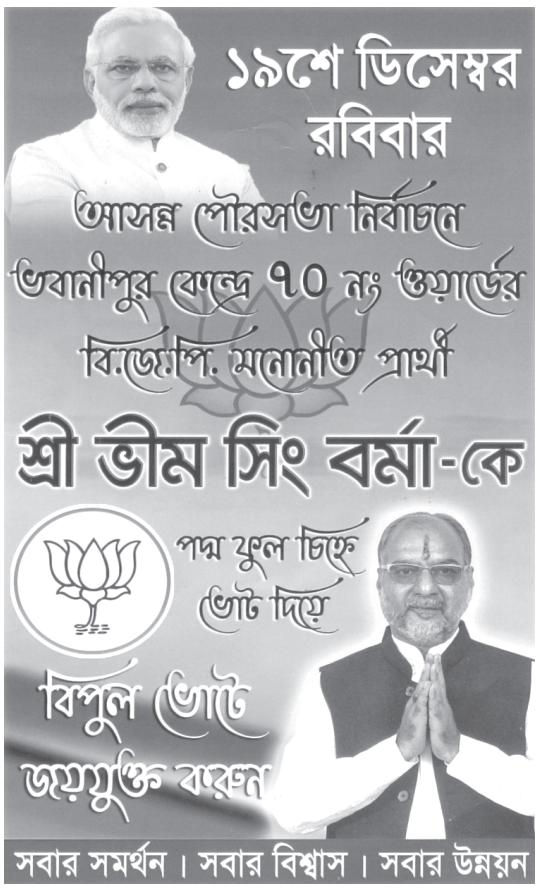

এই মহান বীর যোদ্ধার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা আসছে। তাঁর সৈনিক জীবনের অবদান অবিস্মরণীয়।

বিপিন রাওয়াতের মৃত্যু ভারতের কাছে দুর্ভাগ্যজনক

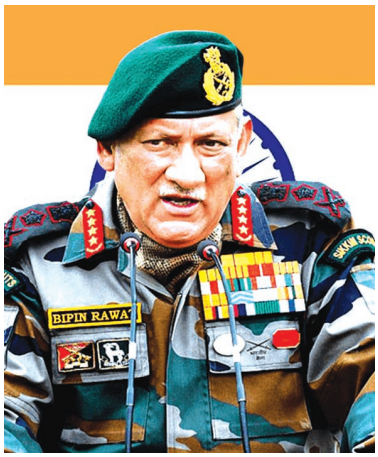

শ্যামল পাল

ভারতীয় সেনার সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াত গত ৮ ডিসেম্বর হেলিকপ্টারে ডিফেন্স সার্ভিস স্টাফ কলেজে যাওয়ার পথে তামিলনাড়ুর কুন্নুরের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে অমতৃলোকে গমন করেন। তাঁর চলে যাওয়া ভারত তথা ভারত সরকারের কাছে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যিনি ভারতের সেনাবাহিনীকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন, তাঁর চলে যাওয়া ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি ভারতের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে তিনি ইন্ডিয়ান আর্মির প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জেনারেল রাওয়াতের চার দশকেরও বেশি সময়ের সৈনিক কেরিয়ার যা তাঁকে প্রতিরক্ষায় তিন ধরনের পরিষেবায় প্রথম জয়েন্ট চিফ নিযুক্ত হতে সাহায্য করেছে। সিডিএস এক অর্থে সরকারের সামরিক- সম্পর্কিত উপদেষ্টা এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বায়ুসেনাকে একছত্রে নিয়ে আসা যাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন।

এরকম একজন ভারত মায়ের সাহসী সৈনিক অসময়ে চলে যাওয়া ভারত সরকার তথা নেতৃবর্গ কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'As India's first CDS General Rawat workes on diver aspect relating to our arm force including defence reforms. He brought with him rich experiment of serving in the Army. India will never forget his exceptional service.' ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ভারতের সেনাবাহিনীতে জেনারেল বিপিন রাওয়াতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'His untimely death is an irreparable loss to our Armed forces and the country. He had served the country with exceptional courage and diligence. As the first CDS he had prepared plan for or jointness of our Armed Force.'

জেনারেল বিপিন রাওয়াত উত্তরাখণ্ডের পৌরি শহরে ১৯৫৮ সালে ১৬ মার্চ এক সৈনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম জেনারেল বিপিন লক্ষ্মণ সিংহ রাওয়াত। তিনি সিমলা থেকে পড়াশোনা শেষ করে খাদাক্কাসলা ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি-তে যোগদান করেন এবং পরে দেরাদুনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি পড়াশোনা ও ট্রেনিং শেষ করে ১৯৭৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর গোর্খা রাইফেলসের পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানে যোগদান করেন। সেখানে দীর্ঘ ১০ বছর দক্ষতার সঙ্গে সেবা করে যান। পরে জম্মু-কাশ্মীরের উরিতে তিনি মেজর হিসেবে নেতৃত্ব দেন এবং ২০০৭ সালে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে প্রমোশন পেয়ে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের নেতৃত্ব দেন। এরপর তিনি দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১১ সালে ১০ অক্টোবর মেজর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ২০১৪ সালে ১ জুন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পুনের সাউদার্ন আর্মিতে যোগদান করেন। ২০১৬ সালে ১ জানুয়ারি থেকে কিছুদিনের জন্য জেনারেল অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৭ সালেই তার সামান্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১ সেপ্টেম্বর ভাইস চিফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ওই বছরই ১৭ ডিসেম্বর ভারত সরকার তাকে ২৭তম 'চিফ অব আর্মি স্টাফ' হিসেবে নিযুক্ত করেন। ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ইন্ডিয়ান ফোর্সের জেনারেল হিসেবে সেনাবহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন।

এই মহান বীর যোদ্ধার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা আসছে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর সৈনিক জীবনের অবদান অবিস্মরণীয়।

২০১৫ সালে মায়ানমারে সীমান্ত পার অভিযানে ভারতীয় সেনা এনএসসিএন-কে তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। উরি অ্যাটাকে অনেক ভারত মায়ের বীর সৈনিকের মৃত্যু হয়। তার প্রতিদান স্বরূপ তিনি ২০১৬ সালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেখানে ভারতীয় সেনা নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে এবং পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে বিমান হামলা চালায়। জেনারেল রাওয়াত নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক থেকে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছিলেন সেদিন। জেনারেল রাওয়াতকে তাঁর সেবার জন্য অনেক সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে— পরম বিশিষ্ট সেবা পদক, উত্তম যুদ্ধ সেবা পদক, অতি বিশিষ্ট সেবা পদক, বিশিষ্ট সেবা পদক, যুদ্ধ সেবা পদক ও সেনা পদক। ভারতবাসী তাঁর অবদান চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে। ◻

সাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত চাওয়া

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করায় ছাত্রের কাছ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত চাইল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। ভাবুন একবার আমরা কোন দেশে বসবাস করছি। কতটা সাম্প্রদায়িক ভাবধারা নিয়ে পরিচালিত হলে একটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রের কাছ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত চাইতে পারে শুধুমাত্র দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করার জন্য। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের করের টাকায়, কেন্দ্র সরকারের মাধ্যমে।

নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করা কি অপরাধ? শুধু এই প্রশংসার জন্যই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দানিশ রহিমের কাছে পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত চেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের শিক্ষক। ভাবা যায়! এ শুধু আমাদের দেশেই সম্ভবত।

এরকম ভারত বিরোধী পাকিস্তান-প্রেমীরা শুধুমাত্র আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে তা নয়। ইতিপূর্বে আমরা জেএনইউ-তেও সন্ত্রাসবাদীদের চেহারা দেখেছি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখেছি। দেশের বিভিন্ন এলাকায় সে বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা উপাসনালয় কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আড়ালে অবলীলায় সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানো এবং ভারত ধ্বংসের পরিকল্পনা করে চলেছে। তাদের এই পরিকল্পনায় পূর্ণ মদত দিয়ে চলেছে দেশেরই সেকুলার নামধারী রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত ঘটনাটা একটু দেখে নেওয়া যাক। সংবাদপত্রে জানা গেছে দানিশ রহিম নামের এক পড়ুয়ার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করায় তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তিনি এও জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত ফেরত চেয়েছে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু জানা গেছে দানিশ রহিম হাইকোর্টে এনিয়ে পিটিশন দাখিল করেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে ভাষা বিজ্ঞানের ডিগ্রি ফিরিয়ে এলএএম ডিগ্রি নেওয়ার কথা বলেছে। তাতে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রিও ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

দানিশের অভিযোগ, এ সবকিছুই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করায়। দানিশ আরও জানান, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছরের ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন। আর এই কারণেই ভাষা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর মহম্মদ জাহাঙ্গির তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

দানিশ বলেছেন, তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিজ্ঞানে পিএইচডি করেছেন। ৯ মার্চ ২০২১-এ তাঁকে ডিগ্রি দেওয়া হয়। আর এখন ছ' মাস পর তাঁকে তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। দানিশ অভিযোগ করে বলেছেন, 'এই বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি প্রফেসর জাহাঙ্গির আমাকে ডেকে বলেন, আপনি একজন ছাত্র আর এই কারণে আপনি কোনও দলের হয়ে কথা বলতে পারেন না। আপনার ভাষা আর সাক্ষাৎকার দেখে আপনাকে কোনও পার্টির সদস্য বলেই মনে হচ্ছে।'

কয়েকবছর আগে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভারতকে টুকরো টুকরো করার প্রতিজ্ঞা যখন করেছিল সেই সময় তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রধানেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে টুকরো টুকরো গ্যাংদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে দেশের তথাকথিত নীতিপরায়ণেরা জেএনইউ-এর বিচ্ছিন্নতাবাদী সমর্থকদের মনে করিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের দেশভাঙার স্লোগান দেওয়া উচিত নয়। আমাদের রাজ্যের যারা বুদ্ধি বেচে খান তারা কিন্তু দানিশের পিএইচডি ডিগ্রি ফেরত প্রসঙ্গে এখনও কিছু বলেনি। এমনও হতে পারে হয়তো তাঁরা মনে করছেন এটি সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়ে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে—'মুসলিম' শব্দ এবং শিক্ষকেরাও মুসলমান। কাজেই মুসলমানদের কোনো অপরাধ দেখতে নেই আর তাদের কোনো কর্মই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়ে না।

দিনের পর দিন দেশের মধ্যে এখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটছে তা দেখে কেন্দ্র সরকার চুপ করে থাকতে পারে না। সরকারের উচিত এই বিষয় নিয়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কড়া ভাবে জবাবদিহি চাওয়া। এবং তার সদুত্তর না পেলে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ করে দেওয়া। উপরন্তু যে শিক্ষক দানিশকে ডিগ্রি ফেরত দিতে বলেছে তাকে বিশ্ববিদালয় থেকে বহিষ্কার করা দরকার।

ছয় ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় নব জাগরণের দিন

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২, প্রবল প্রতিস্পর্ধী একদল যুবক জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে কাঁপিয়ে দিয়েছিল সারা বিশ্বকে। বিকৃত ইতিহাসকে তছনছ করে নামগোত্রহীন সেই যুবকেরা বলিষ্ঠ হাতে উপড়ে ফেলেছিল বাবরের কয়েকশো বছরের উদ্ধত, কলঙ্কময় স্মারক ধাঁচাটিকে। হাজার হাজার বছরের হতাশা, গ্লানি, লজ্জার কলঙ্কময় অধ্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে জেগে উঠেছিল ঘুমন্ত হিন্দু সমাজ। ১৯৪৯ নয়, ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে রামমন্দির ধ্বংসের পর থেকেই মন্দির পুনরুদ্ধারের একের পর এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হয়েছে। অসংখ্য রামভক্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। মুঘল, ব্রিটিশ আমলের সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস কুচক্রী, মেকলীয় ইতিহাসকাররা সযত্নে চেপে দিয়েছে। ইসলামি শাসকরা ভারতবর্ষে হাজার হাজার মন্দির ভেঙেছে। কোথাও কোথাও ভগ্নস্তূপের ওপর মসজিদ নির্মাণ করেছে, এটা ইতিহাস স্বীকৃত।

কিন্তু ভারতবর্ষে এত রাজা-মহারাজা থাকতেও কোনো রাজা বা মহারাজা মসজিদ ভেঙেছে অথবা তার ওপর মন্দির নির্মাণ করেছে এমন কোনও উদাহরণ কিন্তু এই দেশে এখনও পর্যন্ত ঘটেনি (এমন কিছু ঘটুক সেটা আমরা চাইও না)। যে ধাঁচাটিকে মসজিদ প্রমাণ করবার জন্যে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ও বিকিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন বা এখনও করছেন, সেটির নীচে কিন্তু একটি মন্দিরের কাঠামো পাওয়া গিয়েছে। এটা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বহু অনুসন্ধান এবং অত্যাধুনিক স্ক্যানে আজ প্রমাণিত সত্য। ধাঁচাটির নীচে মন্দিরের যাবতীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর ধান্দাবাজ রাজনীতিক, আর দিনার প্রাপ্তির আরবি হাঁড়িকাঠে মাথা গলানো বুদ্ধি ব্যবসায়ীর দল সেই ১৯৯২ সাল থেকেই তারস্বরে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে হাত-পা ছুঁড়েছেন। প্রলাপ বকেছেন, পছন্দের পত্রিকায় দলবদ্ধ ভাবে একের পর এক হিন্দু সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ করে গেছেন, আজও করছেন। যদিও শীর্ষ আদালত রামমন্দির নির্মাণ বিন্দুমাত্র আটকায়নি, কিন্তু এরা ক্রমশ রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে অপ্রাসঙ্গিক, গুরুত্বহীন হয়ে গেছেন। আজ রামমন্দির ভেঙে নির্মিত কলঙ্ক চিহ্ন বাবরিধাঁচা ধ্বংসের ঐতিহাসিক দিনে কোটি কোটি প্রণাম জানাই ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেইসব অনামী যুবকদের যারা হতাশা, সাংস্কৃতিক পরাধীনতায় নিমজ্জিত একটি ঘুমন্ত জাতির গ্লানিমুক্তি ঘটিয়ে পরম মর্যাদায় পুনঃস্থাপন করেছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে। ধাঁচাটি থাকলে আজকের দিনে মন্দির নির্মাণ সম্ভব হতো কি? সন্দেহ আছে।

—**মন্দার গোস্বামী,**
খাগড়া, বরহমপুর।

‘শেম অন ইউ’ ইমরান খান!

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এক টুইট করে বলেছেন, ‘শিয়ালকোটের ফ্যাক্টরিতে লোমহর্ষক আক্রমণ এবং একজন শ্রীলঙ্কান ম্যানেজারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা পাকিস্তানের জন্যে লজ্জাজনক। আমি নিজে এই ঘটনার তদন্ত তদারকি করছি এবং অপরাধীরা যে আইনের সর্বোচ্চ সাজা পাবে তাতে কারো সংশয় থাকা অনুচিত’। তাঁকে বলতে চাই, ‘এই নারকীয় ঘটনার পরও কি আপনি দাবি করতে পারেন যে, পাকিস্তান একটি সভ্য দেশ? শ্রীলঙ্কা মাত্র ক’দিন আগে পাকিস্তানকে কুড়ি হাজার কর্নিয়া (চোখ) দান করেছে, এরপরও আপনারা ‘চোখ থেকেও অন্ধ’। ধর্মান্ধতা আপনাদের অন্ধ করে রেখেছে। ‘শেম অন ইউ’।

টুইটার একটি চমৎকার মাধ্যম, আপনি সাধারণ হয়েও রাজা-বাদশাদের কাছে আপনার বক্তব্য পেশ করতে পারেন। তাঁরা সেটি দেখেন কিনা তা ভিন্ন ব্যাপার। মাঝে-মধ্যেই আমি বাইডেন, মোদী, পিটিআই বা নিউইয়র্ক টাইমসকে টুইট করি, কে জানে, যদি ‘লাইগ্যা যায়’? আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার টুইট অ্যাকাউন্ট খুঁজেছি, পাইনি? পেলে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে তাঁর কাছেও লিখতাম। বাংলাদেশে যাঁরা ফেইসবুক নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, কখন সেটি হ্যাক হয়ে ‘ইসলাম অবমাননার’ অভিযোগ উঠে, তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ‘টুইটার’ ব্যবহার করতে পারেন।

মিডিয়া জানাচ্ছে, শিয়ালকোটে একটি ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ছিলেন শ্রীলঙ্কার নাগরিক প্রিয়াঙ্কা কুমার। ফ্যাক্টরির দেওয়ালে কিছু আরবি ভাষায় লেখা পোস্টার তিনি নিজ হাতে সরিয়ে দেন, তিনি জানতেনও না পোস্টারে কী লেখা আছে? পুলিশ পরে জানিয়েছে, পোস্টারে কোরানের আয়াত ছিল। এই অপরাধে ফ্যাক্টরির শ্রমিকরাই তাঁকে পিটিয়ে মারে, পরে শ্রমিক-জনতা মিলে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, তবে ধর্মান্ধ জনতার নির্মমতা আরও স্পষ্ট হয়, যখন তাঁরা সানন্দে আগুনের শিখার সঙ্গে সেলফি তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

বাংলাদেশে কি এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে বা ইতিমধ্যে ঘটেনি? আমাদের প্রতিক্রিয়া তখন কী ছিল? আমরা কি শুধু পাকিস্তানকে গালিগালাজ করে আমাদের দায়িত্ব শেষ করবো, নাকি এমন ঘটনা যেন না ঘটে এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হবো? পাকিস্তানের পুলিশ বলেছে, তাঁরা ঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিতে পারেনি, তাই প্রিয়াঙ্কা কুমারকে বাঁচানো যায়নি? আমাদের পুলিশও কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেনি বলেই অক্টোবরে কুমিল্লায় দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদের ওপর তাণ্ডব চলে, যা পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। রামু, নন্দীরহাট, সাতক্ষীরা, কুমিল্লা, রংপুর, নাসিরনগর সর্বত্র আমরা কি একই চিত্র দেখতে পাই না?

কুমিল্লার নানুয়ার দিঘিতে সেদিন লাইভ করা হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কীভাবে উৎসবে পরিণত হয়েছিল। কারা তা করেছিলেন? শিয়ালকোটে শ্রীলঙ্কার প্রিয়াঙ্কা কুমার ‘ধর্মীয় অনুভূতিতে’ অজান্তে আঘাত দিয়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। এই ‘অনুভূতি’র আগুনে এ সময়ে বাংলাদেশ জ্বলছে, ইতিমধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। ২০০১-এ রাঙ্গুনিয়ার শীলবাড়িতে বাইরে থেকে দরজা আটকিয়ে শিশু ও নববধূ-সহ

১১ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, বিচার কিন্তু আজও হয়নি, একমাত্র জীবিত স্বপন শীল বিচারের দাবিতে আজও দ্বারে-দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শিয়ালকোটের ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতা হয়তো শুধরানো সম্ভব, কিন্তু যে মানুষগুলো ধর্মের নামে এই বর্বরতায় মেতে উঠলো, যাঁরা দাউ দাউ আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতে পারে— ধর্মের নামে এই পৈচাশিক উল্লাস, মনুষ্যত্বের এমন বিপর্যয়, আর যাইহোক ধর্ম নয়! আর কতকাল এসব চলবে কে জানে? তবে এই ঘটনার পর শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সম্পর্ক কোনদিকে মোড় নেয় তা এখন দেখার বিষয়।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধি বন্ধ হোক

বর্তমানে মোবাইলের ব্যবহার অত্যধিক হারে বেড়েছে। গ্রাম থেকে শহরের অধিকাংশ মানুষ মোবাইলের মাধ্যমে কথাবার্তা বলেন। ডিজিটালের যুগে ঘরে ঘরে স্মার্টফোন। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ফোন কোম্পানিগুলো মোবাইলের মাশুল তেমন ভাবে বাড়ায়নি। সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকা রিচার্জ প্ল্যান ছিল। ফ্রি সিম, ফ্রি ইনকামিং কল, এগুলো বেশ কিছু দিন আগেও ছিল। গরিব, সাধারণ মানুষের মোবাইলের ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে মোবাইল একটি যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই ফোন কল যেমন করা হোক না কেন ইনকামিং কল থাকা দরকার। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ফোন কোম্পানিগুলো ন্যূনতম রিচার্জ প্ল্যান প্রথমে ৩৫ টাকা, তারপর ৪৯ টাকা, ৭৯ টাকা, কয়েক মাস অন্তর বৃদ্ধি করে। কিন্তু সেটাকেও বাড়িয়ে ন্যূনতম ৯৯ টাকা প্ল্যান করেছে। সাধারণ মানুষের কথা না ভেবেই মোবাইলের প্ল্যানগুলোর দাম বৃদ্ধি অনৈতিক। যদিও বর্তমানে মোবাইলের টাওয়ার পরিষেবা একেবারে খারাপ। গ্রাহক বৃদ্ধির অনুপাতে মোবাইল কোম্পানিগুলো টাওয়ার পরিষেবা বাড়ায়নি। অথচ ন্যূনতম রিচার্জ ভাউচার প্রতি নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের এই মোবাইল টাওয়ার ও মোবাইলের পরিষেবার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া তৈরি করতে গেলে সাধারণ মানুষ যাতে ইন্টারনেট পরিষেবা সুলভে ভোগ করতে পারেন সেটা অবশ্যই দেখা উচিত। জিও কোম্পানি সবার হাতে স্মার্ট ফোন সস্তায় তুলে দেবে বলেছিল। প্রথমে সাধারণ মানুষ উৎসাহের সঙ্গে জিও স্মার্ট ফোন ও জিও সিম গোটা দেশে ব্যাপক ভাবে চালু হয়। কম টাকার রিচার্জ ভাউচার দিয়ে সাধারণ মানুষকে মোবাইলের ব্যবহারে অভ্যস্ত করে দেওয়া হয়। এখন মোবাইলের ২৮ দিনের জন্য ইন্টারনেট ও কলের খরচ ন্যূনতম ১৯৯ টাকা আর ৫৬ দিনের খরচ ৩৯৯ টাকা। যা ৮৪ দিনের খরচ ছিল ৩৯৯ টাকা। বর্তমানে অতিমারির সময়েও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সাধারণ মানুষের হাতে তেমন পয়সা নেই। তারপর দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফোন কোম্পানিগুলো মোবাইলের টাওয়ার পরিষেবা তেমনভাবে বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপাচ্ছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য কোনো সরকার এই নিয়ে কিছু বলছে না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র টেলিফোন পরিষেবা বিএসএনএল ভগ্নদশা করে সাধারণ মানুষকে বেসরকারি কোম্পানির সিম ব্যবহার করতে বাধ্য করা হলো। বেসরকারি কোম্পানিগুলোর নিয়মিত মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধি বন্ধ করা হোক। সরকারের উচিত এদের মোবাইলের ন্যূনতম মাশুল ঠিক করে দেওয়া যাতে সাধারণ মানুষ সহজে মোবাইলের ব্যবহার করতে পারে। এয়ারটেল ও ভোডাফোনে ম্যাসেজ আউটগোয়িং পেতে গেলে ১২৯ টাকা ন্যূনতম রিচার্জ করতে হবে যা আগে ছিল না। গ্যাস বুকিং বা কোনো কিছু লগইন করতে ম্যাসেজ পরিষেবা প্রয়োজন কিন্তু মোবাইলের কোম্পানিগুলো সেটার উপর অতিরিক্ত কর আদায় করছে। বর্তমানে আধুনিক ডিজিটাল যুগে সাধারণ মানুষকে মোবাইলে ব্যবহার সহজে করতে দেওয়া উচিত। যাতে তারা ঘরে বসেই অনলাইন পরিষেবাগুলো পেতে পারে। আর এই জন্য সরকারের উচিত ফোন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কথা বলে মোবাইলের ঘন ঘন মাশুল বৃদ্ধি রোধ করা এবং কম খরচের একটি সস্তা প্ল্যান সাধারণ মানুষের জন্য ঠিক করা। মোবাইলের মাশুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠছে। তারা হয়তো মোবাইলের ব্যবহারের বদ অভ্যাসের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করে মোবাইল রিচার্জ করছেন। কিন্তু ঘন ঘন মোবাইল মাশুল বৃদ্ধি বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, সেই ঝড় রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারকেই আঘাত করবে।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের কয়েকটি প্রশ্ন

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শাসনভারকে যদি দুই ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে, (ক) কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের শাসন, (খ) বিজেপি ও তার সহযোগীদের শাসন। প্রথম দলের শাসনকাল দীর্ঘ। ৬০ বছরের কিছু বেশি। বাকিটা বিজেপি ও তার সহযোগীদের শাসনকাল। সংবাদপত্রে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক শুধু মোদীবিরোধী লেখা লিখে নাম যশ করেছেন। আজ তাদের সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন। ১. দুই শাসনকালে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা। ২. দুই শাসনকালে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ও দেশের বিরোধী দলগুলোর অবস্থান। ৩. দুই শাসনকালে কোনো মহামারি বা অতিমারি হয়েছিল কিনা? হলে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? ৪. দুই শাসনকালে কোন দলের বিরোধী নেতারা দেশের শত্রুদের হয়ে কথা বলেছেন? ৫. কোন শাসনকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যশ জগদ্‌ব্যাপী হয়েছে? ৬. ১৯৬২ সালে অসহায়ের মতো মার খাওয়ার পর কোন শাসনকালে চীনকে চাপে রাখতে সীমান্ত বরাবর রাস্তা ও রেলপথ তৈরি হয়েছে? ৭. কোন শাসনকালে শত্রুদেশের সুবিধার্থে দীর্ঘদিন রাজপথে বসে আন্দোলন হয়েছে? জানি এর উত্তর তাঁরা দেবেন না। তবে এই নিয়ে ভারতের বন্ধুরা চর্চা করলেই দেশের মানুষ জাগ্রত হবে।

—শ্যামল হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

আধুনিকতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়

অগ্নিশিখা নাথ

চেনা শহরের বুকে কিছু অচেনা ছবির মতো ইদানীং একটি ছবি বড়ো বেশি ভাবায়। যে শিক্ষা সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ বাঙ্গলার নারী, সেই শিক্ষায় কোথায় যেন বড্ড বেশি ছোঁয়া লেগেছে পাশ্চাত্যের। একদল কলেজছুট ছেলে-মেয়ে কোলাহলে মাতোয়ারা, দাঁড়িয়ে বা বসে শপিংমলের শিড়িতে, এ চিত্র খুব চেনা। সত্যি কথা বলতে দেখতে ভালোও লাগে বেশ। ওদের ওই অকৃত্রিম হাসি দেখলে নিজেদের সেই রোদমাখা দিনগুলো মনে পড়ে যায় যখন হাসবার জন্য আলাদা করে কারণ খুঁজতে হতো না। কিন্তু এই ভালো লাগার ছবির পালটে যাওয়া পরিবর্তনটা ইদানীং বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। বৃত্তের সবকটি তরুণ-তরুণীর হাতই ধোঁয়াযুক্ত।

মনে প্রশ্ন আসে, নেশায় মগ্ন হওয়াটা কি আজকের এই প্রজন্মের কাছে একটি স্টেটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে? বোধহয় তাই। সিগারেট হাতে প্রত্যেকটি মেয়েই কত সাবলীল। হয়তো এটিও তাদের আধুনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার। তবে এখানেও প্রশ্ন আছে। আধুনিকতার সঠিক মানে কি সত্যি আমরা বুঝি? না আমরা আমাদের উত্তরসূরিকে বোঝাতে পেরেছি?

আধুনিক হয়ে ওঠার নেশায় পোশাকআশাকও হয়ে উঠছে খোলামেলা। অতীতে যেগুলো টিভির পর্দায় দেখা যেত তা এখন চোখের সামনেই মেনে নিতে হয়। অস্বস্তি হয় যখন ১৪ বছরের ছেলেকে নিয়ে মেট্রো রেলে উঠি আর সামনের সিটে স্লিভলেস টপ ও মিনিস্কার্ট পড়া মেয়েটি পায়ের ওপর পা তুলে সাবলীল ভঙ্গিমায় বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে গল্প করে। বেশ বুঝতে পারছি যে আমার মতোই ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও অস্বস্তিতে ভুগছেন কিন্তু মুখে কিছুই বলার উপায় নেই। ওই যে একটা ভূত চেপে রয়েছে মাথায়— আধুনিক হতে হবে। যেন তেন প্রকারণে হয়ে উঠতে হবে ওই সাদা চামড়ার দেশগুলোর মতো। যা হচ্ছে হোক, চলছে চলুক— এভাবেই মানিয়ে নিচ্ছি আমরা বা বলা যায় আনডাইজেস্টেবেল ম্যাটারগুলোকে চোখে সইয়ে নিচ্ছি যতই বদহজম হোক না কেন। ইদানীং অবশ্য বড়োরাই অনেক ক্ষেত্রে বেশ গর্বের সঙ্গে বাচ্চাদের পশ্চিমি কায়দা শেখাচ্ছেন আগ্রহের সঙ্গে। সেদিন দেখলাম বারো-তেরো বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে মায়ের হাত ধরে যাচ্ছে যার পরনে শর্ট-প্যান্ট ও টাইট টি-শার্ট। ভালো কথা। যে বয়সে মেয়েকে হাত ধরে শেখাতে হবে শালীনতার অর্থ, সেই বয়সেই আমরা তাকে একধাপ এগিয়ে দিচ্ছি অশালীনতার দিকে আধুনিকতার মোড়কে। শহরের কিছু কিছু নির্দিষ্ট স্থানে তো মেয়েদের পোশাকের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখাই থাকছে না। উলটো দিকে লজ্জায় হয়তো নিজের চোখই নামিয়ে নিতে হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন ঘোমটা টেনে বাড়ির মেয়েরা বাইরে বেরোতো। মাকেও দেখতাম যখন ঘরে ঠাকুরদা আসতেন মা মাথায় ঘোমটা টেনে দিতেন। মাকে শাড়ি ছাড়া আর কোনও পোশাকে দেখিনি কখনো। মানছি ৩০ বছর আগের কথা কিন্তু এই কটা বছরের মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরম্পরা সবই কি ভুলতে বসেছি আমরা?

বিদেশি পোশাক পরে মদ্যপান করলেই তাতে আধুনিকতার তকমা লাগে এই চিন্তা যে সম্পূর্ণ ভুল সেই শিক্ষা তো দিতে হবে আমাদেরই। 'আধুনিকতার' আসল অর্থ হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার বিকাশ। স্বেচ্ছাচারিতাকে আধুনিকতার নাম দিয়ে কুশিক্ষাকে গ্রহণ করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই।

সেদিন আরও একটি কুৎসিত দৃশ্য চমকে দিল। কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ৮বি বাসস্টপে বাস থেমেছে, বাস থেকে নামবো, হঠাৎ দেখি সামনের বাসস্টপের শেডে চেয়ারে বসা তরুণ-তরুণী নিজেদের আলিঙ্গন করে আরও এমন কিছু করছে যা শালীনতার সব সীমাকেই অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রথমে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ছেলের সামনে এরকম কোনো দৃশ্য টিভির পর্দাতেও দেখতে অভ্যস্ত নই আমি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সেদিন প্রতিবাদ করলাম। কারণ প্রতিবাদটা সেদিন প্রয়োজন ছিল। সদ্য ১৪-তে পা দেওয়া ছেলেকে যে শিক্ষায় বড়ো করতে চাইছি সেই শিক্ষাতেও নইলে ফাঁক থেকে যেত সেদিন।

বর্তমান সমাজের এই সব টুকরো টুকরো ছবিগুলো যখন একটা একটা করে জুড়তে বসি তখনই আতঙ্কের মেঘ ঘনীভূত হয় মনে। এ কোন অসভ্যতা গ্রাস করছে আমাদের সমাজকে। এ সংস্কৃতি তো আমাদের নয়। গ্লোবালাইজেশনের ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌরাত্ম্য আর এই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের দৌলতেই বিদেশি মনোবৃত্তি যেন আরও হাড়ে মজ্জায় ঢুকে পড়ছে কচিকাচাদের মধ্যে। ফেসবুকের বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজি গান শোনে, ইংরেজি মুভি দেখে আর হয়ে উঠতে চায় ওদের কার্বন কপি। তানপুরা হাতে ভারতীয় রাগ সংগীত গাইবার থেকে গিটার হাতে রক গাইবার ঝোঁক বেশি। ভয় হয়, এই বিশ্বায়নের ঝড় আমাদের নিজস্ব ভাবধারাকে একটু একটু করে সম্পূর্ণ গিলে না ফেলে।

এই ঝড়ের মুখে প্রদীপকে দুহাত দিয়ে আগলাতে হবে অভিভাবকদের, বিশেষ করে মায়েদের। বঙ্গনারীর শোভা যে সিগারেটের ধোঁয়ায় নষ্ট হয়ে যায় তার বোধজ্ঞান দিতে হবে মেয়েকে। বিদেশি পোশাক পরে মদ্যপান করলেই তাতে আধুনিকতার তকমা লাগে এই চিন্তা যে সম্পূর্ণ ভুল সেই শিক্ষা তো দিতে হবে আমাদেরই। 'আধুনিকতার' আসল অর্থ হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ শিক্ষার বিকাশ। স্বেচ্ছাচারিতাকে আধুনিকতার নাম দিয়ে কুশিক্ষাকে গ্রহণ করার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। ▮

পুষ্টিগুণে ভরপুর রঙিন ফলমূল ও শাকসবজি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রাকৃতিকভাবে রঙিন খাদ্যদ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। রঙিন শাকসবজি ও ফলমূলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যবর্ধক পুষ্টিগুণ থাকে। যেমন ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, থিয়ামিন (ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অঙ্গ), রাইবোফ্লেভিন, ফোলিক অ্যাসিড, আয়রন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কেরাটিনয়েড এবং বিভিন্ন ফাইটোকেমিক্যাল ইত্যাদি। এছাড়াও প্রাকৃতিক খাদ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে জল ও স্বাস্থ্যবর্ধক আঁশ। বেশিরভাগ শাকসবজি ও ফলমূলে চর্বি ও সোডিয়াম কম মাত্রায় থাকে।

ক্যালোরির পরিমাণও কম থাকে এ-ধরনের খাদ্যে। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে রঙিন খাবার শরীরের সুগার ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। অবশ্য, আলু, মাটি আলু, কাঠ আলু, কচু, চীনা আলু, আম, কাঁঠাল, সবেদা ইত্যাদিতে কিছু পরিমাণে ক্যালোরি থাকে। সবুজ শাকসবজির মধ্যে পুদিনা, ধনেপাতা, পালং ইত্যাদিতে যথেষ্ট আয়রন থাকে। এছাড়া শাক ও মোচাতেও ভালো আয়রন রয়েছে।

সজনে পাতা, মেথিশাক ইত্যাদিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। সবুজ শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম ও পটাসিয়াম থাকে। এছাড়া এগুলিতে চর্বি ও সোডিয়ামের পরিমাণ সামান্য। যে কোনো সবুজ শাক হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা করে। সম্প্রতি এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, শাকসবজি ও ফলমূলে ফাইটোকেমিক্যাল নামের এক দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে থাকে। এগুলি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, প্রদাহরোধী, ব্যাক্টেরিয়ারোধী এবং প্রতিরোধী শক্তিবর্ধকের কাজ করে।

ফাইটোকেমিক্যাল সমৃদ্ধ খাদ্য

ফ্ল্যাভোনলস : লেবু, কমলা, পাম, পিচ আপেল, অ্যাপরিকট, সবুজ শাকসবজি, হলুদ ক্যাপসিকাম ও ব্রকোলিতে প্রচুর পরিমাণে

ফ্যাভোনলস থাকে।

লেরিংজেনিন : কমলা, জাম্বুরা, মৌসুম্বি ইত্যাদি ফলে যথেষ্ট পরিমাণের লেরিংজেনিন থাকে। রক্তের কোলেস্টরেলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এর জুড়ি মেলা ভার।

অ্যান্থোসায়ানিনস : লাল আলু, ডালিম, স্ট্রবেরি, চেরি ও পামে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এটি হৃৎপিণ্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের সুরক্ষা করে।

বিটাক্যারোটিন : আম, আম জাতীয় হলুদ ফল, লাউ, গাজর ইত্যাদি সবজি ও শাকে যথেষ্ট বিটাক্যারোটিন থাকে। আমাদের শরীরে এটি ভিটামিন এ-তে পরিণত হয়। এটি ক্যানসার রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

লাইকোপিন : টমেটো, তরমুজ ইত্যাদি লাল ফলে লাইকোপিন থাকে। এটি প্রোসেস্ট গ্ল্যান্ড ক্যানসার ও হৃদরোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।

ফিজেটিন : স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, আপেল, আঙুর ও পেঁয়াজে ফিজেটিন থাকে। এটি বার্ধক্য রোধে সহায়ক। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রাকৃতিকভাবে নিরাময় করতে সবুজ শাসকবজি তথা আঁশ জাতীয় সবজি ও ফল লাভদায়ক। এগুলিতে বিদ্যমান প্রচুর পরিমাণের জল ও আঁশ খিদে মেটায়। এতে ক্যালোরিও কম থাকে। ফলে ওজনও হ্রাস হয় তাড়াতাড়ি। শাকসবজি ও ফলমূলে টাইপ টু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ তথা প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে।

এছাড়াও, এগুলি খাদ্যনালী, পাকস্থলী, মলাশয়, ফুসফুস ও ফেরিংসের ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। হৃৎপিণ্ড ও রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রেরও সুরক্ষা করে এগুলি। এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খেলে মগজে অ্যামাইলয়েড প্লাক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ফলে অ্যালঝাইমার রোগ হতে পারে না। অন্য এক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, শাকসবজি ও ফলমূল চোখে ছানি পড়া, ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ এবং উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদিরও সম্ভাবনা হ্রাস করে।

প্রচুর শাসকসবজি ও ফলমূল খান। এগুলি শুধু পুষ্টিদায়কই নয়, সব দিকে স্বাস্থ্য রক্ষা করে। প্রতিবার খাওয়ার সময় অন্তত পাঁচ ধরনের সবজি খান। মুখরোচক খাবারের পরিবর্তে ফল-মূল খাওয়ার অভ্যাস করুন। শিশুদের ছ' মাস বয়স থেকেই শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ানো যেতে পারে। এগুলি পেস্ট করে খাওয়াবেন। শিশুদের খাবারের সঙ্গে এই পেস্ট মেশান। প্রথমে অল্প পরিমাণে দেবেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণও বাড়াবেন। এতে এটি তার অভ্যাসে পরিণত হবে যা পরবর্তী সময়ে ফলপ্রসূ হবে। □

বছর শেষে ছুটির দেশে

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

টাকি

শীত এখনও জাঁকিয়ে পড়েনি। এই নরম শীতে যদি আপনি জঙ্গল ও নদী দুইই চান তাহলে আপনাকে টাকি যেতে হবে। ওখানে আছে গোলপাতার জঙ্গল ও ইছামতী। ভোরবেলায় ইছামতীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া আর বেলা বাড়লে জঙ্গলের হাজারো পাখির কিচিরমিচিরে হারিয়ে যাওয়া। দু-তিনদিনের জন্য মন্দ লাগবে না।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে টাকি রোড স্টেশন। সময় লাগবে দু' ঘণ্টার মতো। স্টেশন থেকে গেস্ট হাউসগুলি কাছেই। রিকশা ও টোটো দুইই পাবেন। তবে যে গেস্ট হাউসেই থাকুন আগে থেকে বুক করে যাবেন।

কী দেখবেন

টাকি জোড়া মন্দির, রায়চৌধুরীদের জমিদার বাড়ি, উপেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতি বিজড়িত নলকূপ, গোলপাতার জঙ্গল এবং টাকি ইকো পার্ক।

কোথায় থাকবেন

● নৃপেন্দ্র অতিথিশালা, ফোন : (ক) ৯৩৩১০২৬৫৮৫, (খ) ৯৩৩৯৩৭৫৯১৫। এই অতিথিশালাটি টাকি মিউনিসিপালিটির পরিচালনাধীন। ভাড়া-৬০০-১২০০ টাকা।

● সুহাসিনী গেস্ট হাউস, ফোন-(ক) ৯৩৩০৮২৬৭৭৯, (খ) ৮০১৬০৬৫৩০৯। এখানকার প্রতিটি ঘর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা আছে। ভাড়া-৮০০-১২০০ টাকা।

● হোটেল সোনার বাংলা, ফোন- (ক) ০৩২১৭২৩৩৯৯৯। Email ID : taki@hotelsonarbangla.com.। ভাড়া-১৬০০-৪৫০০ টাকা।

মৌসুনী দ্বীপ

সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ কমই পাওয়া যাবে। বাঙ্গালির সমুদ্র পুরী, দিঘা আর নয়তো মন্দারমণি। এই তালিকায় মৌসুনী দ্বীপ একেবারেই আলাদা। শান্ত, নিরিবিলি এবং নৈসর্গিক শোভায় অপরূপ। এখানে এলে থাকতে হবে টেন্টে অথবা কটেজে। সেটাও একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। চাইলে এখান থেকে বকখালি ও জুনপুটের সমুদ্রতটে ঘুরে আসতে পারেন।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদা থেকে ট্রেনে নামখানা চলে যান। স্টেশন থেকে টোটোয় করে ফেরিঘাট। নদী পেরিয়ে টাটা ম্যাজিক ভাড়া করে চলে আসুন

দুর্গাপুর ঘাটে। আবার নদী পেরিয়ে চলে আসুন বাগডাঙা ঘাটে। সেখান থেকে আবার টোটো। এবার সোজা মৌসুনী দ্বীপ।

কোথায় থাকবেন

● বালুচরি বিচ টেন্ট। ছয়জনের উপযোগী টেন্টে থাকার খরচ মাথাপিছু ১২০০ টাকা। মাটির বাড়িতে থাকার খরচ মাথাপিছু ১৪০০ টাকা। বাঁশের তৈরি কটেজে থাকার খরচ মাথা পিছু ১৩০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৩৫৭৭০০৭০ এবং ৯৭৪৯১৮৭৫০৪।

● নীল নির্জনে। এখানে টেন্টে থাকতে হলে মাথা পিছু খরচ

১২০০ টাকা। এসি কটেজে মাথাপিছু ১৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ৭৪৩৯৭৭৬১৯৯ এবং ৯৮৩৬১১১০৩৪।

● আরণ্যক বিচ টেন্ট ক্যাম্প। এখানেও টেন্ট এবং কটেজের ব্যবস্থা আছে। খরচ মোটামুটি একইরকম। যোগাযোগ : ৭০৩১৬২৬২৪১। খাওয়ার খরচ সব জায়গাতেই আলাদা।

বাগুরান জলপাই

পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রতটের শেষ নেই। বাগুরান জলপাই সেরকমই একটি সমুদ্রতট। লাল কাঁকড়ায় ভরা সৈকত আর ধেয়ে আসা বড়ো ঢেউ এখানকার বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যেবেলায় চাঁদের আলোয় এই ভার্জিন বিচে আপনার মন রোম্যান্টিক হয়ে উঠবেই। বছর শেষে দু'-তিনদিনের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা বাগুরান জলপাই।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ট্রেনে কাঁথি। সেখান থেকে শেয়ারে জিপ ভাড়া করে বাগুরান জলপাই। যারা বাসে বা গাড়িতে আসতে চান তারাও এই রুটে আসবেন।

কোথায় থাকবেন

এখানে থাকার জন্য একটাই রিসর্ট আছে। সাগর নিরালায় রিসর্টটির নাম। যোগাযোগ : ৯৪৩৪০১২২০০ এবং ৮৬৭০৫৪৭৪১১। এখানে ফোর বেড কটেজে থাকলে ভাড়া প্রতিদিন ৩০০০ টাকা। থ্রি বেড কটেজে থাকলে ভাড়া প্রতিদিন ২,৫০০ টাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা।

সমুদ্র নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে কথা ফুরোবে না। কলকাতা থেকে মাত্র ১৬৫ কিলোমিটার দূরে কাঁথি সাব ডিভিশনের মধ্যে পড়ে বাগুরান জলপাই। চোখের দৃষ্টি যতদূর যাবে দেখতে পাবেন সোনালি বালিয়াড়ি। তার চারপাশে গভীর ক্যাসুরিনা জঙ্গলের পাঁচিল। যতদিন থাকবেন ততদিন তো বটেই, এমনকী শহরের একঘেঁয়ে কোলাহলে ফিরে আসার পরেও বাগুরান আপনাকে নরম আদরে ঢেকে রাখবে। বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বাগুরান জলপাইয়ের রোমাঞ্চকর পর্যটনের কথা ভুলতে।

গনগনি

আসুন, বাঙ্গলার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। জায়গাটার নাম গনগনি। বর্ষায় শিলাবতী নদীর ধারে গনগনিকে দেখলে আপনার অ্যারিজোনার আসল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা মনে পড়ে যাবে। সবুজ বন, বেলেপাথরের পাহাড় আর শিলাবতীকে নিয়ে গনগনি অসাধারণ। শীতকালে শিলাবতীতে বেশি জল থাকে না। খালি পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার কাছে এমন একটি জায়গা স্রেফ ভাবা যায় না। এখানে বেড়াতে যাওয়ার সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

কীভাবে যাবেন

ট্রেনে গেলে সাঁতরাগাছি থেকে রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসুন গড়বেতায়। গড়বেতা থেকে গনগনি যাওয়ার জন্য টোটো পেয়ে যাবেন। ডানলপ, সাঁতরাগাছি এবং চন্দ্রকোণায় গড়বেতা যাবার বাস পাবেন। বাসে আসতে চলে আসুন চন্দ্রকোণা টাউন অথবা চন্দ্রকোণা রোডে। এখান থেকে গনগনি যাওয়ার গাড়ি পেয়ে যাবেন।

কোথায় থাকবেন

হোটেল সুরুচি। ভাড়া : ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬০৯৪৫৫৬০২।

কী দেখবেন

সর্বমঙ্গলা মন্দির, রায়কোটা দুর্গ, বাগরির কৃষ্ণারি জিউ মন্দির, আমলাগোড়া জঙ্গল, বাগডোবা জঙ্গল, ভদ্রেশ্বর কালী মন্দির এবং গনগনি ক্যানিয়ন।

সোনাঝুরির জঙ্গল

সোনাঝুরি মানে যেখানে আকাশ থেকে সোনা ঝরে। কলকাতা থেকে সামান্যই দুরে যদি আপনি সবুজ প্রকৃতির মধ্যে ডুবে যেতে চান তা হলে অবশ্যই সোনাঝুরির জঙ্গলে চলে আসুন। এই জঙ্গলকে ভারতের সব থেকে পরিষ্কার জঙ্গল বলা হয়। এখানে এলে সারাদিন আপনার চারপাশে কিচিরমিচির করবে টিয়া, মাছরাঙা আর কাঠঠোকরার দল। হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবেন সবুজ গাছগাছালি। এখানে এসে চলে যান কোপাইয়ের ধারে। কিংবা রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত আশ্রমে। এই আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা অনেক জিনিস আছে। সোনাঝুরিতে প্রত্যেক শনিবার হাট বসে। চাইলে হাট থেকে কেনাকাটা করতে পারেন। যদি ভোরবেলায় দুর্গাটুনটুনির ডাক শুনতে চান তাহলে চলে যান বল্লভপুর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারিতে। অক্টোবর থেকে মার্চ সোনাঝুরি যাওয়ার সেরা সময়।

শনিবারের হাট

কীভাবে যাবেন

হাওড়া, শিয়ালদা বা কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেনে প্রান্তিক বা বোলপুর শান্তিনিকেতন স্টেশনে চলে আসুন। সেখান থেকে সাইকেল রিকশা বা টোটোয় সোনাঝুরি। বাসে যেতে চাইলে কলকাতা এবং শিলিগুড়ি থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার বাস পাবেন।

কোথায় থাকবেন

(১) সোনাঝুরি অতিথি নিবাস। ভাড়া : ৫০০-৩০০০ টাকা। যোগাযোগ : ৯৬৩৫২০০৪৯৬। (২) শকুন্তলা ভিলেজ রিসর্ট। ভাড়া : ৯৫০-২৬৫০ টাকা। যোগাযোগ : ৯২৩২৬৩৭৪৩৯। (৩) রামশ্যাম ভিলেজ রিসর্ট। ভাড়া : ১৫৯৯-১,৯৯৯ টাকা। যোগাযোগ : ৯৪৭৫০৩২৮১০ এবং ৭০৭৬৩১৯৬৬৪।

জুনপুট

যদি আপনি নিজের সঙ্গে একা থাকতে চান, যদি হারিয়ে যেতে চান একাকী এক সমুদ্রকে বন্ধু করে— তা হলে জুনপুটে চলে আসুন। দিঘা থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দূরের এই সমুদ্রতটে নির্জনতাই হয়ে উঠবে আপনার দোসর।

কীভাবে যাবেন

গাড়িতে যেতে চাইলে বিদ্যাসাগর সেতু ধরে সোজা চলে যান দিঘা। সেখান থেকে সহজেই পৌঁছে যাবেন জুনপুটে। কলকাতা ও শিলিগুড়ি থেকে দিঘা পর্যন্ত বাস সার্ভিস আছে। দিঘা থেকে জুনপুট যাওয়ার জন্য ট্রেকার সার্ভিস। ট্রেনে যেতে চাইলে দিঘা বা কাঁথি হয়ে যান। কাঁথি থেকে জুনপুট যাওয়ার বাস পাবেন। যদি কলকাতা থেকে প্রাইভেট কার ভাড়া নিয়ে যেতে চান তা হলে খরচ পড়বে ২৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

থাকার জন্য জুনপুট রিসর্ট আছে। এখানে নন-এসি রুমের ভাড়া ৬০০ টাকা থেকে শুরু। এসি রুমের ভাড়া ১১০০ টাকা থেকে শুরু। যদি গ্রাউন্ড ফ্লোরে ডবল বেড স্ট্যান্ডার্ড রুমে থাকতে চান তাহলে নন-এসির জন্য খরচ পড়বে ৫০০ টাকা আর এসি রুমের জন্য ১০০০ টাকা। বুকিঙের জন্য যোগাযোগ : দেব রায়, সি ডি-২৫৯, সেক্টর ১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪। ফোন : ৯৮৩১১৬৭৫৩৭ /৯৮৩১২৭৬৬৫৬।

ডুয়ার্সের বৈঠকখানা থেকে দুয়ারসিনির হেঁশেলে

অনামিকা দে

ডুয়ার্স :

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ ও ভুটানের প্রবেশদ্বার হলো ডুয়ার্স। চা-বাগান, পাহাড়ি জঙ্গল ও তিস্তা নদীর উপত্যকা সব মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এটি রোমাঞ্চকর পর্যটন কেন্দ্র। এই পুরো ভৌগোলিক অঞ্চলটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে এক শৃঙ্গ গণ্ডার, হাতির দাপট আর সরীসৃপের স্বাভাবিক আনাগোনা যে কোনো জঙ্গলপ্রেমীকে মুগ্ধ করবে।

কী কী দেখবেন :

গোরুমারা ন্যাশনাল পার্ক, বক্সা টাইগার রিজার্ভ, আলিপুরদুয়ার, চাপড়ামারী অভয়ারণ্য, সান্তালেখোলা, নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক, সামসিং, লাভা-লোলেগাঁও ও জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। এগুলির মধ্যে অনেক জায়গায় আপনি জলঢাকা হয়েও যেতে পারেন।

কীভাবে যাবেন :

কলকাতার শিয়ালদা স্টেশন থেকে সুপরিচিত ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে করে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে মালবাজার জংশন। আপনি যদি প্রথম গোরুমারা যেতে চান আপনি নিউ মাল জংশনে নামবেন। এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারেন লাটাগুড়ি ও মূর্তি। যদি জলদাপাড়া গেলে ট্রেন থেকে নামতে হবে হাসিমারা। জলদাপাড়া অভয়ারণ্য হাসিমারা থেকে ১১ কিলোমিটার দূরত্বে, ট্যাক্সিতে ১৫ মিনিট।

কোথায় থাকবেন :

'রিসোর্ট হেডেন ইন'-এর সুপার ডিলাক্স স্যুট কটেজ রুম, ভাড়া ১,৮৬৪ টাকা। 'হোটেল হোম স্টে জলদাপাড়া'--- যোগাযোগ : ১৮০০২০৮৭২৫২, ভাড়া-৩০০০ টাকা থেকে ৪৫০০ টাকা।

জলঢাকা :

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়ে লুকোনো উপত্যকা জলঢাকা এক রোমাঞ্চে ভরা প্রকৃতির সুন্দর রূপ। দেশের কয়েকটি হিল স্টেশনের মধ্যে জলঢাকাও একটি যা আপনাকে অভিভূত করবে নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, রোমাঞ্চে ও একইসঙ্গে শান্তির বাতাবরণে।

আকর্ষণীয় স্থান : জলঢাকা নদী

স্বচ্ছ নীল জল এই উপত্যকার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। চারিদিকে সবুজ ও ধূসর পাথরের মাঝে অবস্থিত জলঢাকার সবচেয়ে নির্মল এবং প্রশান্তিদায়ক সাইটগুলির মধ্যে এটি একটি।

করোনেশন ব্রিজ :

শহরের কেন্দ্র থেকে করোনেশন ব্রিজটি প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে। ১৯৩৭ সালে (ষষ্ঠ) জর্জ এবং রানি এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল এই ব্রিজটি।

গোরুমারা :

জলঢাকা থেকে প্রায় ৬৫.৬ কিলোমিটার দূরে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান। এই জাতীয়

করোনেশন ব্রিজ

গোরুমারা জাতীয় উদ্যান

উদ্যানটি দেশের অন্যতম অভয়ারণ্য। এই অভয়ারণ্যের কোনো স্থান যাতে বাদ পড়ে না যায় তাই অবশ্যই চেক লিস্ট সঙ্গে রাখুন।

লাটাগুড়ি :

শহর থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হিল স্টেশন লাটাগুড়ি। আপনি যেতে পারেন এখানকার বেশ কিছু আকর্ষণীয় স্পটে, তার মধ্যে রোভার পয়েন্ট এবং জয়তি মহাকাল গুহা পর্যটনের মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

চাপরামারী জাতীয় উদ্যান :

জলঢাকা থেকে ৬৯.২ কিলোমিটার দূরে এই অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রধান অভয়ারণ্য— চাপরামারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। অসংখ্য প্রাণীর সমাগম আপনাকে মুগ্ধ করে তুলবেই।

কীভাবে পৌঁছবেন জলঢাকা :

শিয়ালদা বা কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেনে শিলিগুড়ি। অথবা প্লেনে গেলে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত আপনি বাসেও ট্রাভেল করতে পারেন। জলঢাকা কলকাতা থেকে ৬৫০ কিলোমিটার। শিলিগুড়ি থেকে ৬৯ কিলোমিটার দূরে। স্টেশন বা এয়ারপোর্ট থেকে আপনি প্রাইভেট কার ভাড়া নিয়ে জলঢাকা পৌঁছতে পারেন।

জলঢাকা ভ্রমণের সেরা সময় :

আপনি যদি জলঢাকা ভ্রমণের সর্বাধিক আনন্দ উপভোগ করতে চান, তাহলে শীতের শুরুতেই জলঢাকা ঘুরে আসুন। শীতকাল এই অত্যাশ্চর্য শহরটি উপভোগ করার সেরা সময়।

কোথায় থাকবেন :

জলঢাকা নদী থেকে হাঁটাপথ দূরত্বে 'জলঢাকা হোম স্টে'। ফোন নাম্বার-০৯০৭৩০২৬১৪৫। হোটেল ভাড়া প্রতিদিন ৪,৫০০ টাকা। 'জলঢাকা রিভার রিসোর্ট' আরও একটি থাকার উপযুক্ত স্থান। এটি লাটাগুড়ির নাগরাকাটায় অবস্থিত। ভাড়া ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা।

দুয়ারসিনি ফরেস্ট :

দুয়ারসিনির জঙ্গলের জনমানবশূন্য বন্য পরিবেশে একটি রাত, শুধু পাতার খসখস শব্দ আর বন্যপ্রাণীর হুংকার--- এ এক প্রকৃত রোমাঞ্চকর অনুভূতি। এর সঙ্গে নদীস্রোতের কলকল শব্দ। সব মিলিয়ে দুয়ার্সিনি হয়ে উঠেছে এক মায়াপুরী। পুরুলিয়ার দুয়ারসিনি যেন অপার শান্তির দেশ। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটোখাটো পাহাড়। সঙ্গে সবুজের সমারোহ। জঙ্গলে রয়েছে শাল, পিয়াল, শিমুল, পলাশ বহেড়া ইত্যাদি গাছ। এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে সাতগুরু নদী। এখানকার জঙ্গলে হাতি, ভল্লুক, বুনোশুয়োর, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি প্রাণীর বাস। আর আছে চেনা-অচেনা পাখির দল। সাতগুরুং-এর ধারে বসে পড়ন্ত বিকেলে কেটে যাবে আনমনা সময়, দূরের বনবাসী গাঁ থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ শুনতে শুনতেই চলে যাবেন স্বপ্নের দেশে।

কখন যাবেন :

দুয়ারসিনির আবহাওয়া সবসময় পর্যটনের সহায়ক। বছরের যে কোনো সময় আপনি এখানকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

কীভাবে যাবেন : দুয়ারসিনি ও কলকাতার মধ্যে কোনও সরাসরি ট্রেন নেই। তবে কলকাতা থেকে ঘাটশিলা যাওয়ার ট্রেন ধরে সেখান থেকে দুয়ারসিনিতে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যেতে পারবেন। ঘাটশিলা কলকাতা থেকে প্রায় ২৪০ কিলোমিটার এবং দুয়ারসিনি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কোথায় থাকবেন :

দুয়ারসিনিতে থাকার জন্য সেরা ব্যবস্থা হলো বন উন্নয়ন নিগমের পরিচালিত কটেজগুলি। এই কটেজে থাকবার পাশাপাশি খাবারের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : ৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। কলকাত-১৩। ফোন নম্বর : ০৩৩-২২৩৭০০৬০/০৩৩-২২৩৭০০৬১।

স্রোতস্বিনী জলঢাকা

হাত বাড়ালেই তীর্থক্ষেত্র বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

গত তিন বছরে দূরে কোথাও যাওয়া তো দূরে থাক ঘর থেকে বেরোনোর কথাও ভাবতে পারিনি। আর এমনি একসময় আমার এক ভ্রমণ সঙ্গী ধরবাবু আমাদের বাসায় এলো। তার মনের ইচ্ছাও প্রকাশ পেল, কোথাও ঘুরে আসলে কেমন হয়। খুব বেশি দূরে নয়। কাছে-পিঠে একদিনের জন্যে যাওয়া যেতে পারে। মহালয়াও চলে গেছে। মায়ের আগমনি বার্তা শোনা যাচ্ছে। দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিনটাই বেছে নিলাম। হুগলী জেলার ব্যান্ডেল ও ত্রিবেণীর মাঝামাঝি এলাকা বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী মায়ের মন্দিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুর্গা পুজোর প্রতিমা দেখাও হবে আবার নতুন একটা ঐতিহাসিক স্থানও ঘুরে আসা যাবে। যেমনি ভাবা তেমনি সপ্তমী পুজোর দিন সকালে বারাসাত থেকে বাসে শ্রীরামপুর ফেরিঘাটে পৌঁছে গঙ্গার ওপাড়ে গিয়ে হেঁটেই শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে কাটোয়া হয়ে বর্ধমান যাবার ট্রেনও পেয়ে গেলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাঁশবেড়িয়া স্টেশানে পৌঁছলাম। পুজোর সময় সেখানে তেমন কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখলাম না। লোকজন বলতে আমরা দু'জন আর ১০-১২ জন ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছে। স্টেশন রোডে কয়েকটা দোকান খোলা রয়েছে। দোকানিরা খদ্দেরের আশায় তীর্থের কাকের মতো বসে আছে।

আমরা হংসেশ্বরী মন্দিরে যাবার জন্যে অটো রিকশার খোঁজ করলে এক দোকানি বললে মন্দিরের পথ তো মাত্র ১ কিলোমিটার। অটোর অপেক্ষায় থাকলে ততক্ষণে পৌঁছেও যাওয়া যাবে। অতএব তাই সই। আমরা হেঁটেই রওয়ানা হই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। প্রায় ১০০ বছরের বেশি প্রাচীন এই মন্দির। ১৩টি চূড়া বিশিষ্ট ৬ তলার অভিনব এই মন্দিরের গঠনশৈলী অতি দৃষ্টিনন্দন। এর চূড়াগুলি পদ্মের কুঁড়ির আদলে গঠিত। মন্দিরের আশেপাশে রয়েছে বেশ কটি জলাশয়। তবে সপ্তমী পূজার দিনেও মন্দির চত্বরে তেমন দর্শনার্থীর ভিড় দেখতে পেলাম না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ২০-২৫ জন পুণ্যার্থীকে দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথিত আছে রাজা নৃসিংহদেব ১৮০১ সালে এই মন্দিরের কাজ শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ে পরলোকগমন করেন। প্রায় ১৪ বছর পরে তাঁরই সুযোগ্য পত্নী রানি শঙ্করী দেবী এই অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেন। মন্দিরে রয়েছে হংসেশ্বরী মায়ের পঞ্চমুণ্ডির আসন। হংসেশ্বরী মা সহস্রদল পদ্মের ত্রিকোণে বেদীর উপরে দেবাদিদেব মহাদেবের হৃদয় থেকে উৎসারিত দ্বাদশ পদ্মের উপরে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

হংসেশ্বরী মায়ের বাম হস্তে শাণিত অস্ত্র ও দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। সুশোভিত নীলবর্ণের প্রতিমাটি নিম কাঠ দ্বারা নির্মিত। সহাস্য শান্ত শ্রীময়ী মায়ের মাথায় ঘোমটা দ্বারা আবৃত রয়েছে। তবে শুধুমাত্র শ্যামা মায়ের পুজোর রাত্রে বছরের একদিন মা হংসেশ্বরী এলোকেশী রূপে পূজিতা হয়ে থাকেন। মায়ের মন্দিরের পাশেই রয়েছে শ্রীশ্রী বাসুদেবের মন্দির। এই মন্দিরটি পোড়া মাটি দিয়ে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের মতোই তৈরি হয়েছে। দর্শনীয় এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন ১৬৭৯ সালে রাজা রামেশ্বর দেবরায়। পোড়া মাটির ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের নিদর্শন এই মন্দিরটিতে অতীতে কষ্টিপাথরের বাসুদেবের মূর্তি স্থাপিত ছিল। কিন্তু বাসুদেবের সেই প্রাচীন কষ্টিপাথরের অপরূপ মূর্তিটি চুরি হয়ে যাওয়াতে বর্তমানে একটি নতুন মূর্তি পূজিত হচ্ছে। এই মন্দিরের উঁচু ভিটের চারিদিকে ওঠার জন্য সিঁড়ি রয়েছে। আর মন্দিরটির পাশেই রয়েছে অষ্টভুজা দুর্গার নাটমণ্ডপ। এই নাটমণ্ডপে কালিকামাতা ও দুর্গামায়ের বার্ষিক পূজা হয়ে থাকে। নাটমন্দিরের সামনে রয়েছে পূজার সময় পশু বলিদানের ব্যবস্থাও। বাসুদেব ও হংসেশ্বরী মন্দিরের কিছুটা দূরত্বে পতিত অবস্থায় রয়েছে একটি পরিত্যক্ত নহবতখানা। ওখান থেকে ত্রিবেণী সঙ্গম আর জাফরখান গাজির কবর এবং গাজি কর্তৃক সেই বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির ভেঙে ৫ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে যাবার পথের হদিস জেনে নিলাম।

অতীতে বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালি হিন্দুরা ত্রিবেণী সঙ্গমে বিভিন্ন

তিথি ও পালাপার্বণে স্নান করে পূজা ও তিল তর্পণাদি করতো। সেই উপলক্ষ্যে ভাগীরথীর পাড়ে মেলাও বসতো। ত্রিবেণী সঙ্গমের এই ঐতিহ্যের জন্য তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ও তার তীরবর্তী দেবতার নানান মন্দিরের অবস্থিতির ফলে দিল্লির সুলতানদের নজরে পড়ে যায়। স্থানীয় ভাবে জানতে পারি জাফর খান গাজি নামে এক তুর্কি বহিরাগত আক্রমণকারী তার দস্যুদের নিয়ে ত্রিবেণীর প্রাচীন মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাঙচুর করে লুটপাট করে। নারী নির্যাতন ও ধর্মান্তরিত করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। শুধু তাই নয় ত্রিবেণীর বিখ্যাত ঐতিহ্যশালী প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরটি সামান্য রদবদল করে সেখানে মসজিদ ও কবরস্থান স্থাপন করে। আজও সেই কবর এবং তথাকথিত মসজিদে হিন্দুমন্দিরের স্মৃতি চিহ্ন তথা দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের নানান দৃশ্যাবলী রাম লক্ষণ সীতা ও হনুমান ইত্যাদির খোদাই করা প্রস্তর লিপি বিদ্যমান, যা ওই বর্বর গাজির বাহিনীর সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে।

এই তুর্কি বর্বর দস্যুর নামের অপভ্রংশ 'গাজি' কিন্তু নামের অংশ নয়। এটি একটি উপাধি বিশেষ। অর্থাৎ জাফরখান জেহাদের বলে বলীয়ান হয়ে তুর্কি দস্যুদের নিয়ে বাঙ্গলার হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। শুধু ত্রিবেণী সঙ্গম নয় সারা ভারতবর্ষে অতীতের সকল বর্বর বহিরাগত আক্রমণকারীদের মতোই জাফর খানও বিশ্বজুড়ে আল্লার রাজত্ব কায়েম করতে জেহাদে লিপ্ত হয়েছিল।

গাজির ত্রিবেণী দখলের পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু সংস্কৃতি বিধ্বংসের কুকীর্তি আজও বিদ্যমান। কথিত আছে বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা একবার এই জাফর খান গাজির কবরগাহে এসেছিলেন এবং মোনাজাত করে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। এই সিরাজউদ্দৌলা যদিও বাঙ্গলার নবাব ছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গালি ছিলেন না। সিরাজউদ্দৌলা একবার কলকাতা থেকে ইংরেজদের সাময়িকভাবে তাড়িয়ে দিয়ে কলকাতার নামকরণ করেছিলেন আলিনগর। এই দুশ্চরিত্র সিরাজ ফেজি বাঈকে একটা ঘরে আটকে রেখে দরজা জানালা ইট দিয়ে গেঁথে হত্যা করেছিল। কেননা সে বিশ্বস্ত নয় বলে সন্দেহ করেছিল। আমরা এহেন কুখ্যাত দুরাচারী নারী লোভাতুর নবাবের নামে বারাসাতের একটি বিখ্যাত উদ্যানের নামকরণ করেছি 'সিরাজ উদ্যান'!

আমরা যখন গাজির তথাকথিত মসজিদ এবং কবরগাহ থেকে বেরিয়ে আসি তখন প্রায় ৩টা বাজে। নেমে আসার পথে দেখলাম একটি প্রাচীন বৃক্ষের চারপাশে দেওয়াল ঘেরা স্থানে প্রতীকী কারবালা স্থাপন করা হয়েছে। কবরগাহ থেকে নেমে এলে ডান ধারে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সেখানে সপ্তঋষি ঘাটের পাড়েই রয়েছে শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ গিরি পরমহংসদেবের আশ্রম ও ঝাউতলা কালিকামায়ের মন্দির। এই কালিকামায়ের মন্দিরও গাজি কর্তৃক ধ্বংস হয়ে মসজিদ হয়েছিল। গঙ্গাপাড়ের মনোরম পরিবেশে শান্ত স্নিগ্ধ উন্মুক্ত বাগিচা বেষ্টিত আশ্রমটির অবস্থিতি সত্যিই দর্শনীয়। আমরা আর দেরি না করে অভয়ানন্দের আশ্রম দর্শন করে ব্যান্ডেল যাবার জন্যে রওনা হই। ত্রিবেণীর ঘাটের কাছেই অটো পেয়ে গেলাম। মাথা পিছু ৩০ টাকা ভাড়া হিসেবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ব্যান্ডেলের অন্যতম দর্শনীয় চার্চ ও মনাস্ট্রিতে পৌঁছালাম। অতীতে এই ব্যান্ডেলকে ঘিরে পর্তুগিজদের কলোনি গড়ে উঠেছিল। ১৫৯৯ সালে। পর্তুগিজরা এই সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত ত্রিশূল বিশিষ্ট চার্চটি তৈরি করেছিল। এই মনাস্ট্রিতে রয়েছে খ্রিস্টানদের গির্জা, একটি স্কুল ও সিমেট্রি। নানান ফুলের বাগিচা ঘেরা যিশুর জন্ম ও কর্মকাণ্ডের ঘটনাবলী রূপায়ণের চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

চার্চ দেখে যখন ব্যান্ডেল স্টেশানে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। আমরা শিয়ালদহ গামী একটা ট্রেন পেয়ে রওয়ানা হয়ে যাই কলকাতার পথে।

গুজরাটে সংস্কার ভারতীর রাষ্ট্রীয় সাধারণ সভা

গত ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদে (কর্ণাবতী) অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় প্রবন্ধকারিণী ও সাধারণ সভা। সভায় অখিল ভারতীয় সভাপতির দায়িত্বে থাকলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর বাসুদেব কামাথ। সহ সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিদ হেমলতা এস মোহন, বিশিষ্ট ভায়োলিন বাদক মৈসুর মঞ্জুনাথ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা নীতীশ ভরদ্বাজ। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে এলেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অশ্বিন কুমার দলভী। সম্পাদক মণ্ডলীতে আছেন বিশিষ্ট বংশীবাদক পণ্ডিত চেতন জোশী (দিল্লি), শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় (কলকাতা) ও রবি বেড়েকর (নাসিক)। সারা দেশ থেকে ২২৫ জনের বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, ভরত কুণ্ডু, তিলক সেনগুপ্ত, গোপাল কুণ্ড ও উদয় দাস। বৈঠকে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৈদ্ধিক প্রমুখ স্বান্তরঞ্জনজী।

গাজোলে প্রয়াত নন্দদুলাল দাসের বার্ষিক শ্রাদ্ধে কল্যাণ আশ্রমে সহভোজ অনুষ্ঠান

মালদা জেলার গাজোলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নন্দদুলাল দাস স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। একসময় তিনি স্বস্তিকা পত্রিকার গাজোলের প্রচার প্রতিনিধির দায়িত্বও পালন করেছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও এলাকায় বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নামডাক ছিল। গত বছর তিনি করোনা আবহে পরলোকগমন করেন। নিয়ম রক্ষার্থে শুধুমাত্র শ্রাদ্ধবিধি সম্পন্ন করা হয়েছিল। তাই এবার তাঁর দুই পুত্র– প্রভাত দাস, গাজোল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রণব কুমার দাস, রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্যরা মিলে তাঁদের প্রয়াত পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ বনবাসী কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত রায়গঞ্জের মাতঙ্গিনী ছাত্রীনিবাসে করা মনস্থ করেন। সেই উপলক্ষ্যে ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের সহভোজের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের অবনী মাণ্ডি, সুভাষ মাহাত, মণিকা লাকড়া ও পঞ্চানন মাহাতো। অনুষ্ঠান শেষে প্রয়াত নন্দদুলাল দাসের পুত্র ও পুত্রবধূরা এই ছাত্রীনিবাসে মাসিক অনুদানের অঙ্গীকার করেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির দেব দীপাবলী অনুষ্ঠান

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর প্রতি বছরের মতো কলকাতা বাগবাজারের বিচালিঘাটে লক্ষাধিক প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দেব দীপাবলী উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানক্তা কুমারসভা পুস্তকালয়ের সচিব মহাবীর বজাজ বলেন, কার্তিকী পূর্ণিমার দিন ভগবান শিব অত্যাচারী ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে বধ করে দেবতাদের ভয় থেকে মুক্ত করেন। এ কারণে দেবতারা এই দিনে কাশীনগরীতে একত্রিত হয়ে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলন করে ভগবান শিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সমাজসেবী পূর্ণিমা কোঠারী বলেন, এইদিনে রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলনে তাঁর দুই ভাই রামকুমার ও শরদকুমার কোঠারী প্রাণবলিদান করেন। অনুষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

গীতা ও মনুষ্যজীবনের রহস্য

রাকেশ দাস

গীতা শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো যেটি গান করা হয়েছে। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের আঠারোটি অধ্যায় একত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমান ভগবান যেটি গান করেছেন (উপদেশ দিয়েছেন) সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই অংশে ১৮ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদের সার প্রতিপাদন করেছেন। বলা হয় উপনিষদ হচ্ছে গাভী, শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ দোহনকারী, অর্জুন নামক বৎসকে (বাছুর) সামনে রেখে সুধী সাধকদের উপকারার্থে ভগবান গীতা নামক দুগ্ধ দোহন করেছেন।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

গীতা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এটি বিশেষণ পদ। প্রকৃতস্থলে এর বিশেষ্য হলো 'উপনিষদ'। উপনিষদ যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সেজন্য গীতাও স্ত্রীলিঙ্গ। যে বিদ্যা নিঃশেষে অবিদ্যা নাশ করে ব্রহ্মের সমীপে নিয়ে যায় তাকে উপনিষদ্ বলা হয়। গীতাতে প্রতিপাদিত তত্ত্বও সংসারের মায়া নাশ করে ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে সাহায্য করে। সেজন্য একেও উপনিষদ বলা হয়। কিন্তু এটি শ্রুতি নয়, বরং শ্রীমদ্ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদ। সেজন্য সংক্ষেপে একে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৮ অধ্যায়ে এই জগতের অনিত্যতা, আত্মার নিত্যতা, মানুষের কর্তব্য, এই অনিত্য সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তির উপায়, আহারাদির নিয়ম, মনঃসংযমের উপায়, অহিংসা প্রভৃতি পালন, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি উপদেশ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপনিষদের সার বলা হয়। প্রায় সমস্ত দর্শন সম্প্রদায় গীতাকে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব থেকে শুরু করে বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ গীতার ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। গীতার অধ্যায়গুলিকে 'যোগ' বলা হয়। একেকটি অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্ন ও শ্রীভগবানের উত্তর আকারে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, রাজযোগ আদি নানাবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধভূমিতে এই উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ। ধর্ম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

আমাদের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের উপদেশের মূল উদ্দেশ্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। ইন্দ্রিয় সংযম বিনা দুঃখনিবৃত্তির পথ নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবনায় একটি মৌলিক পার্থক্য এই মোক্ষের ধারণা। পাশ্চাত্যের শিক্ষা হলো, সংসারে থাকতে হলে প্রকৃতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, প্রকৃতি মানুষের ভোগের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। অন্যদিকে ভারতীয় ভাবনার মূল শিক্ষা হলো, মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গ। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতিকে জয় করার উপায় হলো নিজের ভোগলিপ্সার নিয়ন্ত্রণ।

এখানে এরকম ভাবলে ভুল হবে যে, পাশ্চাত্য দর্শন কেবল ভোগের

শিক্ষা দেয় এবং হিন্দুশাস্ত্র কেবল ত্যাগের শিক্ষা দেয়। পাশ্চাত্যে বিকশিত বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রেও বহু ক্ষেত্রে ইহজীবনে ত্যাগ ও সংযমের উপদেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সংকল্পনায় ইহজীবনের ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা মৃত্যুর পরে পরলোকে অনন্ত ও অসীম ভোগ লাভ করা যায়। অন্যদিকে হিন্দু সংকল্পনায়, ইহজীবন বা পরলোকেও ভোগ কখনওই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ ভোগ প্রকারান্তরে এক প্রকার দুঃখ। সেজন্য ভোগলিপ্সাকে জয় করেই যথার্থ আনন্দের আস্বাদন সম্ভব।

ভোগলিপ্সা জয় করার উপায় ইন্দ্রিয়সংযম। বলপূর্বক অবদমন করার কথাও শাস্ত্র বলেন না। কারণ অবদমিত কামনা বা বিষয় বাসনা আসক্তিকে নষ্ট করতে সক্ষম নয়। চিত্তে বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্বক সংযত করে রাখার প্রচেষ্টাকে গীতা মিথ্যাচার আখ্যা দিয়েছেন। (গীতা ৩/৬)

সেজন্য হিন্দুশাস্ত্র ত্যাগ ও সংযম পূর্বক ভোগের উপদেশ দিয়ে থাকে। চিত্তশুদ্ধিই মুক্তির পথ। শুদ্ধচিত্ত জীবই কেবলমাত্র ভোগবাসনা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন। সেজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উপদেশই প্রধান। কর্মযোগ হলো নিঃস্বার্থ ভাবে শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যে নিজেকে সমর্পণ। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই যে ভোগ হয় সেই ভোগ একপ্রকার যজ্ঞস্বরূপ। (গীতা ৪/২৬)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রধান উপদেশগুলির অন্যতম হলো যজ্ঞচক্র থেকে বিচ্যুত না হওয়া। গীতা বলছেন—

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।। (৩/১৬)

কারণ, যজ্ঞচক্রই সৃষ্টিচক্র চালনার মূল সূত্র। যজ্ঞচক্র চালনার রহস্য হলো শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম থেকে বিরত না হওয়া। সাধক জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি যে কোনো মার্গেই নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে। কিন্তু গীতাশাস্ত্রের মূল উপদেশ জ্ঞান-ভক্তি-সংযম সমন্বিত কর্মের উপদেশ। বাল গঙ্গাধর তিলক রচিত গীতার ব্যাখ্যার অনুবাদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'ভাষ্যকারদের মধ্যে কেহ-বা জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ-বা ভক্তিতে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ-বা সন্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ভগবদ্গীতা এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই সমন্বয়সাধনের মুখ্য তাৎপর্যটা কী, তাহারই তিলক তাঁহার গীতারহস্যে আভাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে কর্ম্মই গীতার মধ্যবিন্দু-মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবান অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্মের যে গীতার প্রধান কথা তাহাতে সন্দেহ নাই,— কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শুধু 'কর্ম্ম করিবে' বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না; ভগবান বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম্ম অনুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ঈশ্বরের হস্তে ফল সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই শ্রেয়।'

এইকথা সর্বজনবিদিত যে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মূল প্রেরণাস্রোত তিলকের গীতারহস্য এবং বিবেকানন্দের কর্মযোগ। উভয় গ্রন্থেই ছিল নিষ্কাম মর্মবাণী। এই প্রেরণাতেই বিপ্লবীরা তাঁদের কর্ম করে গিয়েছেন, জীবন বিসর্জন দিতে পিছপা হননি।

প্রসঙ্গত, আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সশস্ত্র বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে 'সহিংস' বলে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু বাস্তবিক বিচারে তাঁদের কাজের মধ্যে কোথাও হিংসা বা হিংস্রতা ছিল না। তাঁরা স্বধর্ম অনুসারে নিজেদের কর্ম করেছেন। তাঁদের কর্মে সেই অর্থে কোনো হিংস্রতার চিহ্ন ছিল না। কারণ তাঁরা যা করেছেন যেখানে কোথাও ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা বা জুগুপ্সা ছিল না। বরং, স্বধর্ম, স্বদেশ, স্বজাতি ও স্ব-সংস্কৃতির প্রতি অনাবিল শ্রদ্ধা ছিল। স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে, জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো নৃশংস ঘটনায় ব্রিটিশ রাজশক্তির মধ্যে যে জুগুপ্সা ছিল, অলিন্দ যুদ্ধ কিংবা ভগৎ সিংহ কর্তৃক পার্লামেন্টে বিস্ফোরণে সেইরকম ঘৃণা বা জুগুপ্সা ছিল না।

এই ধর্মবুদ্ধিপ্রেরিত স্বধর্ম ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার ঘৃণাহীন ও মাৎসর্যহীন সংগ্রামের প্রেরণাস্রোত ছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। হিন্দু শাস্ত্রে আধ্যাত্মিকতা দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্ত একেবারে বিচ্ছিন্ন কোনো ভাব নয়। আধ্যাত্মিকতা কেবল পরলোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হিন্দু দর্শনে আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার স্পর্শটির শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল সূত্র। ভোগলালসাহীন ইহজীবনই পরলোকের অদৃষ্ট সুখের সাধন— এই উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে নেই। বরং, ভোগহীন জীবন জড়ের সমানই উপহাসাস্পদ বলেই বিবেচিত। জীবের মধ্যে ঈশ্বর নিজেই ধর্মবিরুদ্ধ কামনা রূপে প্রতিষ্ঠিত (গীতা ৭/১১)। ইহজীবনে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বা স্বধর্ম অনুসারী কর্তব্য পালন ও অকর্তব্য থেকে নিবৃত্তির মাধ্যমে, বৃহৎ স্বার্থকে সম্মুখে রেখে নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধিত হয়— এটিই গীতার মূল তত্ত্ব। সেজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংগ্রামীদের প্রেরণাস্থল হয়ে উঠতে পেরেছে। এই গীতাই তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে সাত্ত্বিক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করেও হত্যা ও হিংসার তামসিক ভাবে জারিত রাজসিক কর্মে প্রবৃত্ত হতে। সেই কারণেই ভারতবর্ষের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অহেতুক ও নিন্দিত নৃশংসতার দৃষ্টান্ত বিরলতম। সশস্ত্র বিপ্লবীরা বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়ানো রাষ্ট্র ও সমাজের অপরাধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন না। নিজেদেরকে পরমেশ্বরের নিমিত্তভূত মেনে রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণের সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বন্দুকের ট্রিগার টানতেন মাত্র।

যুগ যুগ ধরে এই ধারণাই হিন্দু সমাজের মুখ্য প্রেরণা। ভগবান গীতায় বলেছেন যে, এই পরম্পরায় আগত জীবন রহস্যের জ্ঞান কালের দীর্ঘ কুটিল আবর্তে হারিয়ে গিয়েছে। সেই জ্ঞানকেই তিনি পুনরায় অর্জুনের সামনে প্রকট করছেন (গীতা ৪/৩)।

কর্মহীনতা হিন্দুর আদর্শ নয়। গীতা বলেছেন, এক ক্ষণের জন্যও কোনো জীব কর্ম না করে থাকতে পারে না (গীতা ৩/৫)। হিন্দু দর্শনে আধ্যাত্মিকতার দুইটি রূপ— ১. আত্মতত্ত্বের সর্বব্যাপকতাকে উপলব্ধি করার সাধনা, ২. আত্মতত্ত্বের সর্বব্যাপকতাকে উপলব্ধি করে সেই দর্শনের আলোকে কৃতিশীল জীবনযাপন। ভাববাদ বা বাস্তবকে উপেক্ষা করে কেবল অদৃষ্ট ফলের আকাঙ্ক্ষায় জীবনযাপনের উপদেশ গীতা প্রদান করেন না। গীতা একাত্ম মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চিরন্তর ও সনাতন উপদেশের সার।

গীতা একটি বিশাল গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থের একটিই মাত্র নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য তত্ত্ব রয়েছে। ভাষ্যকাররা নিজ নিজ মতের অনুকূলে গীতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ উপনিষদ বা গীতার এটি একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য যে তাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু সমস্ত ব্যাখ্যা সকলের জন্য উপযুক্ত নয়। বাস্তবে বর্তমানে সামাজিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়েই স্বামী বিবেকানন্দের গীতা বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত উপযুক্ত বলেই মনে হয়। স্বামীজী গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলাকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাননি। বরং গীতাকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ফুটবল খেলার কথা বলেছেন। গীতা দুর্বলের সান্ত্বনা নয়। গীতা শক্তিশালীর প্রেরণা। গীতা দুর্বলতা পরিত্যাগ করে নির্ভয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উপদেশ দেয়। সেজন্য বর্তমানের নৈরাশ্যে নিমজ্জিত মানুষের জীবনে গীতা সঠিক ঔষধ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। □

ইহজীবনে চলার পথে গীতাই পথপ্রদর্শক

রামানুজ গোস্বামী

শ্রীমদ্ভবদ্গীতা হিন্দুদের কাছে এক পরম পবিত্র গ্রন্থ। ধার্মিক, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত মাত্রেই গীতার মহিমা প্রসঙ্গে কিছুমাত্রায় হলেও কম-বেশি যে সচেতন, তা বালাই বাহুল্য। এ এক এমনই তুলনাহীন গ্রন্থ, যার বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বলা হয়েছে যে,

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমটন্যঃ
শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।'

—'গীতা ঠিক ঠিক বুঝে অধ্যয়ন করে ভাবসহ তার অর্থ চিত্তে ধারণ করা প্রধান কর্তব্য, যা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবান বিষ্ণুর মুখারবিন্দ নিঃসৃত; অতএব অন্যান্য শাস্ত্রাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন?'

বস্তুত গীতা এক রহস্যময় গ্রন্থ। কোনো ব্যক্তি সমস্ত জীবন ব্যাপী অধ্যয়ন করেও যেন এর অর্থ যথার্থ ভাবে অনুভব করতে ঠিক সেভাবে সক্ষম হয় না। এর অর্থ এটাই যে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই গীতার মর্মবাণী সম্যকরূপে অনুধাবন করতে সমর্থ হতে পারেন, যার হৃদয়ে বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে পরাবিদ্যার জ্ঞান জাত হয়েছে বা উপলব্ধি হয়েছে এবং বলাই রাহুল্য যে, এই প্রকারের সাধক কোটিতে গুটিক। তবু প্রত্যেকেরই প্রত্যহ ভক্তিসহকারে গীতাপাঠ অবশ্যই কর্তব্য, কারণ এতে মন শান্ত ও পবিত্র হয়, চিত্তচাঞ্চল্য নষ্ট হয়, ধৈর্য ও সাহসিকতার সঞ্চার হয়, কর্মের শক্তিলাভ হয়, কল্যাণ কর্মে ব্রতী হওয়ার প্রেরণা লাভ হয়। জীবনের চলার পথে যা যা প্রয়োজন, এককথায় সেই সবরকম সহায়তারই জোগান দেয় এই গীতা। সাধারণের জন্য তাই যথার্থই এ এক অনবদ্য গ্রন্থ।

গীতায় নিহিত আছে বেদ ও বেদান্ত তথা উপনিষদের সারমর্ম। বেদ-উপনিষদ অধ্যয়ন যথেষ্টই শ্রমসাধ্য; তাছাড়া এগুলি নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তিদের পক্ষে অধ্যয়ন করাটা বেশ কষ্টসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে 'ভগবদ্গীতা' সকল বর্ণের, সমস্ত স্তরের, সব মানুষের জন্যই একান্ত উপযোগী। গীতায় রয়েছে সেই সবকিছুই যা একাধারে সাধক ও সন্ন্যাসী জনের পক্ষে পরমাকাঙ্ক্ষিত, অন্যদিকে সাধারণ গৃহী যারা, তাদের জন্যও গীতায় রয়েছে অমৃত। গীতা তাই জগতে এক বিরল গ্রন্থ।

বহু সহস্র বছর ধরে মুনি-ঋষি, পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ও গবেষকদের দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থের অসংখ্য ভাষ্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি রচিত হয়েছে। নিঃসন্দেহেই এগুলির প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন আঙ্গিকে গীতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এইকথা কোনো ভাষ্যেই পাওয়া যাবে না যে, সেটিই গীতার একমাত্র সঠিক ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা। কারণ সবগুলিই এক এক ভাবে এই দিব্য গ্রন্থটিকে বিশ্লেষণ করেছে এবং তাই সবকটিই সমানভাবে পরিপূর্ণ ও সঠিক। কিন্তু মজার কথা এই যে গীতা অসীম, অনন্ত। তাই এই কথা বলাই বাহুল্য যে গীতার ওপর যতই আলোকপাত করা হবে ততই এর ভাবের গভীর থেকে আরও গভীরতর স্তরে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হব। তাই দরকার হচ্ছে গীতার নিয়ত চর্চা। কোনো মানুষ যদি নিজের যথার্থ মঙ্গল কামনা করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই গীতা অধ্যয়নে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ গীতার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষ তথা জীবকে সেই পথ চিনিয়ে দেওয়া যাতে তার প্রকৃতার্থেই কল্যাণ হয়, পরমার্থ প্রাপ্তি ঘটে। আমরা দেখি যে গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তিমার্গ প্রসঙ্গে দিকনির্দেশ বা

পথনির্দেশ করেছেন, তেমনি মানুষের কর্তব্যকর্ম, ঈশ্বর-উপাসনা, বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রসঙ্গেও আদর্শ ধর্ম কী বা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়েও গীতায় বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই গীতা আমাদের পথ চলতে শেখায়। আদর্শ জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়।

গীতার উৎপত্তিস্থান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমরাঙ্গন। আমরা জানি যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন এক মহা সমস্যায় পড়ে ভগবানের শরণাপন্ন হন। মূলত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরেই গীতার সূচনা। তবে এই গীতারহস্য যা কিনা অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে আগামীদিনের সমস্ত জীবের কল্যাণ তথা মুক্তির জন্য ব্যক্ত হয়েছে তা শ্রীভগবান এর আগেও বলেছিলেন। এই ভগবদ্‌গীতা সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ বলেন সূর্যদেবকে, সূর্যদেব তা বলেন মনুকে, মনু বলেন ইক্ষ্বাকুকে— পরিশেষে ভগবান আবার স্বয়ং এই গীতাজ্ঞান প্রদান করলেন অর্জুনকে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে গীতোপনিষদ আখ্যায়ও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কথা বলে গেছেন যে, তিনিই স্বয়ং ভগবান। তাই এই প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ রাখা উচিত নয়। প্রসঙ্গত, এই কথা উল্লেখ করা দরকার যে, এই মহান শাস্ত্রের মহিমা অন্তত কিঞ্চিৎমাত্রায় হলেও তখনি উপলব্ধি করা যাবে যখন শ্রীকৃষ্ণের ভগবৎসত্তাকে আমরা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারব। ঈশ্বর বা ভগবানের থেকে বিচ্যুত হয়ে, সরে এসে যতই আমরা অনিত্য বস্তুতে মনকে সন্নিবিষ্ট করছি, ততই বাড়ছে আমাদের ক্ষোভ, অতৃপ্তি, ভয়, অশান্তি। গীতার পাতায় পাতায় রয়েছে এই সব জড়বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়। আর উপায় একটি মাত্র নয়। জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, কর্ম— নানাবিধ পথে চলেই সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব। মানুষে সর্বাবস্থায় সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনই গীতার বিষয়বস্তু।

একটা কথা আধুনিককালের মানুষ অনেকসময়ই ভুল ভেবে থাকেন— তা হলো যে গীতায় এই যে এতকিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যেহেতু মানুষের জড়বন্ধন থেকে মুক্তির হেতু এবং পারমার্থিক লাভের পথকে সুপ্রশস্ত করে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে যায়, তাই এগুলি বোধহয় সন্ন্যাসীদের জন্যই। সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে এসব সম্ভব নয়। কথাটি শুধুই যে ভুল তাই নয়, হাস্যকরও বটে। গীতা সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত আশ্রম, সমস্ত বর্ণ ও মতের মানুষের জন্যই এক অতুলনীয় ও অমূল্য আকর। জড় বন্ধন থেকে মুক্তি অর্থে সংসার ত্যাগ করা নয়— অজ্ঞানতার যে আবরণ মানুষকে তার স্ব-রূপ উপলব্ধিতে বাধা দেয়, তাকে ছিন্ন করা; অর্থাৎ গীতারূপ অস্ত্রের দ্বারা মোহাবরণ ছিন্ন করে পরমার্থলাভের প্রয়াসী হওয়া। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রারম্ভে নিজের বিপক্ষে আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তিনি আর যুদ্ধ করবেন না বলে মনস্থির করেন। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল অর্জুনের মোহজনিত এক প্রকার দুর্বলতা। এই দুর্বলতাই তাঁর কর্তব্যকর্ম পালনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই অর্জুন অতঃপর শ্রীভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে অর্জুনের মন ও বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের মোহান্ধকার চিরতরে দূর করে দিলেন। গীতারূপ অমৃতময় আলোকবর্তিকার পরশে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হলো অর্জুনের হৃদয়। এরপর তিনি পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করলেন। ভগবান অর্জুনকে এই উপদেশই দিলেন যে নিজের সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম সাধন করেও তাঁকে সবসময় স্মরণ করতে হবে। সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করে চলতে হবে। কথাটা এই যে, ভগবান একবারও এই কথা কোথাওই বলেননি যে, ওহে, তোমরা কেউ কোনো কাজকর্ম করো না। বনে-জঙ্গেলে, পাহাড়-পর্বতে গিয়ে সবাই আমার ধ্যান কর। এমন কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন না কারণ, তিনি স্বয়ং ভগবান আর ভগবান কখনই অবাস্তব কথা বলেন না। কথাটা এই যে, ভগবানের স্মরণ-মনন প্রতিটি ক্ষেত্রেই করতে হবে আবার সমস্ত কর্তব্য-কর্মও করে যেতে হবে, এই কথাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, যার যা কর্ম, তাকে তো তা করতেই হবে, কিন্তু সমস্ত কাজের মাঝেও তাঁকেই স্মরণ করে কাজ করে যেতে হবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও এই কথাই বলেছেন বারবার। তিনি বলতেন, 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। সুতরাং এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের কাজে-কর্মের মধ্যেও সর্বক্ষণই ভগবৎ চিন্তাই যেন আমাদের মনকে ঘিরে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পরম আশ্বাস দিয়ে বলছেন,

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।'

(গী. ১৮।৬৬)

সুতরাং আমাদের অবশ্য কর্তব্য হলো শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিবেদন করা; তবেই আমরা নিশ্চিতভাবেই মুক্ত হব। এই কথা বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন জলে স্নান করে মানুষ নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্‌গীতারূপ জলে একটি বারও স্নান করে, তাহলে তার জড়জীবনের মলিনতা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এই কথা বহু মহাপুরুষ, সিদ্ধসাধকের দ্বারা অনুভূত সত্য। তাই এর একবর্ণও মিথ্যা নয়। আধুনিককালে জড় বিজ্ঞানের অত্যধিক উন্নতিসাধন ঘটে চলেছে। মানুষের জীবন পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি করে ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। ঈশ্বরোপাসনা, ভগবৎভক্তি, ধার্মিকতার যথার্থ ভাব— এসব এখন দিন দিন কমে আসছে। ফলে বাহ্যিক উন্নতি, জাঁকজমক যতই বেড়ে চলুক না কেন, অবক্ষয় আর অনাচার মানুষকে বিনাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে। তাই পরমপুরুষের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই দিব্যবাণীই এখন আমাদের রক্ষা করতে পারে। তাই অনবরত গীতা অধ্যয়ন করতে হবে।

গীতাজ্ঞানকে জীবনের আশ্রয় করে আমাদের চলার পথে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই ইহজীবনে পরম শান্তি, ভগবানের কৃপা ও অন্তিমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। ◻

‘বিজ্ঞান-শিক্ষা’য় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস

পিন্টু সান্যাল

চতুর্থ পর্ব

গ্রিসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস খুঁজতে হলে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত বেশিরভাগ গ্রিক নামের সঙ্গেই আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির যোগ পাওয়া যায়। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি তৈরি হলো কেমন করে? ইতিহাসে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি আর গ্রিস যেন সমার্থক। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি এবং এর প্রাচীন বইগুলিকে গ্রিসের সৃষ্টি বলে দাবি করার কি কোনো প্রমাণ আছে? আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে গ্রিক ও মিশরীয় সংস্কৃতির যুগলবন্দি বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আলেকজান্ডার বিনা রক্তপাতে মিশর জয় করেছিলেন এবং এর প্রতিদান হিসেবে মিশরীয়দের উপাসনার প্রতি সম্মান জানাতে মিশরীয় দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর টলেমি একইপথে হেঁটেছিলেন কারণ তিনি জানতেন মিশরের ক্ষমতা, মিশরীয়দের সমর্থন ছাড়া সাম্রাজ্য ধরে রাখা যাবে না। কিন্তু মিশরীয় সংস্কৃতির প্রতি অত্যধিক ঝুঁকে পড়াও টলেমির পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তা সৈন্যবাহিনীর গ্রিক সৈন্যরা তা ভালোভাবে গ্রহণ করতো না। তাই টলেমি উভয় সংস্কৃতির জন্যই পথ খোলা রেখেছিল।

ভারতের মতো মিশরেও মন্দিরের সঙ্গেই গ্রন্থাগার থাকতো আর আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারটি মিশরীয় দেবতা সেরাপিসের মন্দির সংলগ্ন ছিল। এই তথ্যগুলি প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার সংস্কৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। কয়েক হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রিসের পক্ষে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির পাঁচ লক্ষেরও বেশি বই লেখা কী করে সম্ভব? সেই সময় বই লেখা হতো প্যাপিরাসে। আর প্যাপিরাস আমদানি করতে হতো মিশর থেকে যার খরচ অত্যন্ত বেশি। প্যাপিরাস অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়ায় এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ এবং প্যাপিরাসে লিখিত বইগুলির পুনর্লিখনের প্রয়োজন হতো।

তাছাড়া প্রতিনিয়ত যুদ্ধরত গ্রিসের মানুষের এতো বই লেখার মতো অবসর থাকার কথা নয়। গ্রিক ঐতিহাসিক স্ট্রাবোর মতে গ্রিসে অ্যারিস্টটল প্রথম ব্যক্তি যার লাইব্রেরি ছিল অর্থাৎ আলেকজান্ডারের আগে গ্রিসের কোনো লাইব্রেরির কথা জানা যায় না। প্লেটোর মতে, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির আগে গ্রিসে বিজ্ঞান বলে কিছু ছিল না। চাঁদ পৃথিবীর অংশ— গ্রিসে এই সত্য কথা বলাই ছিল সক্রেটিসের মস্ত বড়ো অপরাধ। এমনকী অ্যারিস্টটলকে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য এথেন্স থেকে পালাতে হয়েছিল। এইরকম অসহিষ্ণু ও কুসংস্কারে পূর্ণ সভ্যতায় বিজ্ঞান-চর্চা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডেটাসকে উচ্চশিক্ষার জন্য মিশরে যেতে হয়েছিল। হেরোডেটাসের মতে অনেক গ্রিক-দেবতা মিশরীয় দেবতাদের অনুকরণমাত্র। আলেকডান্ডারের আগে গ্রিসে কোনো বিজ্ঞান চর্চা ছিল না।

বেশিরভাগ গ্রিক নাম যাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত প্রত্যেকে আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, যেমন আর্কিমিডিস, ক্লডিয়াস টলেমি, ইউক্লিড— এদের কেউই গ্রিসের এথেন্স থেকে আসেননি।

তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশের আলেকজান্দ্রিয়াকে গ্রিকদের কৃতিত্ব বলে দাবি করার কি কোনো যুক্তি আছে? সেই জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে গ্রিক-সংস্কৃতির গর্ভজাত বলা কি যুক্তসঙ্গত? কারণ আলেকজান্দ্রিয়ার উপর মিশরীয় প্রভাবের প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

আলেকজান্ডারের পূর্বে গ্রিসে বিজ্ঞান চর্চা ও লাইব্রেরির অস্তিত্বনা থাকলে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির এত বই এল কীভাবে? আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি কীভাবে ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টীয় ইউরোপ টলেডো লাইব্রেরি ও তার আরবিতে অনুবাদ করা মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার নিজেদের দখলে নিয়েছিল। কিন্তু এইধরনের ঘটনা আরও কয়েক শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছিল। মিশর, পার্সিয়া, ব্যাবিলনের মতো পুরাতন সভ্যতাগুলির কয়েকশো বছরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তাদের জ্ঞানচর্চা ও সেই জ্ঞান নথিবদ্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। পার্সিয়ার

সম্রাট দারিয়ুসকে পরাজিত করার পর, পার্সিয়ার প্রচুর বই আলেকজান্ডারের দখলে চলে আসে কিন্তু এতো বইয়ের খুব অল্পই আলেকজান্ডারের পরামর্শদাতা অ্যারিস্টটল পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। তার বেশিরভাগই পড়ে থাকে বর্তমান মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পারস্যে' প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখযোগ্য... 'ডাক্তার বললেন, আলেকজান্ডার এই প্রাসাদ পুড়িয়ে ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। আমার বোধ হয় পরকীর্তি-অসহিষ্ণু ঈর্ষাই তার কারণ। তিনি চেয়েছিলেন মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করতে, কিন্তু মহাসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় তাঁর আগেই দেখা দিয়েছিল। আলেকজান্ডার আকেমেনীয় সম্রাটদের পারস্যকে লণ্ডভণ্ড করে গিয়েছেন।

'এই পর্সিপোলিসে ছিল দরিয়ুসের গ্রন্থাগার। বহু সহস্র চর্মপত্রে রুপালি সোনালি অক্ষরে তাঁদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা লিপীকৃত হয়ে এইখানে রক্ষিত ছিল। যিনি এটাকে ভস্মাসাৎ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এর কাছে বর্বরতা। আলেকজান্ডার আজ জগতে এমন কিছুই রেখে যায়নি যা এই পর্সিপোলিসের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপে তুলনীয় হতে পারে।'

প্রাচীন গ্রিকদের সময়কাল খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের অনেক আগেই। তাই প্রাচীন গ্রিকদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ার থিয়ন প্রোক্লুসের সঙ্গে চার্চের বিরোধ হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার দার্শনিকদের জ্ঞানতত্ত্ব যাজকদের কর্তৃত্বকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিল, যাজকরা সাধারণ মানুষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিল।

দার্শনিকদের প্রশ্নের সামনে খ্রিস্টান যাজকরা বিব্রত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। ঐতিহাসিক গিবনের মতে খ্রিস্টান যাজক থিয়োফিলাস সেরাপিসের মন্দির ও তার সংলগ্ন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংস করে। এই ঘটনার সঙ্গেই খ্রিস্টীয় ইউরোপের অন্ধকার যুগের শুরু বলা যায় কারণ আপন মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তির বদলে শক্তির প্রয়োগ শুরু হলো। এই অন্ধকার থেকে বেরে হয়ে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে লেগে গেল প্রায় ৫০০ বছর, ইউরোপ নতুন ভাবে জাগল।

ইউরোপ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিল কিন্তু সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস সম্পর্কে সত্য বলতে কিংবা সেই জ্ঞানের জন্মদাতা সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হতে ইউরোপ কি পারল?

ইউরোপ কি জ্ঞানতত্ত্বের দর্শনকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করল শুধুমাত্র উপাসনা পদ্ধতির স্বার্থে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে ভিন্ন সংস্কৃতিকে মান্যতা দিলে নতুন ইউরোপের লক্ষ্যপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটতো। তাই ক্রুসেডের পরে ইউরোপ ঠিক করলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে এমন সংস্কৃতিকে কৃতিত্ব দিতে হবে যাদের সঙ্গে ইউরোপের বর্তমানে সংঘাতের কোনো সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ যে সংস্কৃতি আগেই তাদের রঙে রঞ্জিত হয়েছে।

গ্রিসকে সমস্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে দেখিয়ে সেই জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হিসেবে 'নবজাগরিত' ইউরোপ নিজেকে দেখাতে শুরু করলো।

আমরা দেখলাম ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে কখনো লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নয়তো বিজেতার সংস্কৃতিকে পরাজিতের উপরে চাপিয়ে দিতে পরাজিতের জ্ঞানকে ভাষান্তর করে অন্যভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। বিজেতাগণ আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কখনো একটি বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জনসমর্থন আদায় করেছেন, কখনো আপন উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণকে তাদের কর্তৃত্বের বিরোধিতা হিসেবে দেখেছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে যে যেসব বিজেতা, বিজিতের জ্ঞানকে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির উপযোগী মনে করেছে তারা বিজিতের কৃতিত্বকে ইতিহাস থেকে যথাসম্ভব মুছে দিতে পরাজিতের সংস্কৃতির সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ-সন্ধিক্ষণে ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া বা গ্রন্থাগারের বিপুল পরিমাণ বইয়ের অনুবাদ আমরা দেখতে পাই।

পরাধীন জাতিকে দীর্ঘকাল পরাধীন করে রাখতে হলে সেই জাতির নিজস্বতাকে নষ্ট করে দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের চিন্তায় হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দিতে পারলে পরাধীন জাতি পরাধীনতাকেই শ্রেয় বলে মনে করে।

মিশরীয় সভ্যতা এই কৌশলেই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভারতবর্ষ এখনো টিকে থাকলেও তার শিক্ষা আপন সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গেছে। আরবীয়রা পার্সিয়া জয়ের পর যা করেছিল, খ্রিস্টীয় ইউরোপ ক্রুসেডের সময় যা করেছিল, গ্রিস মিশর জয়ের পর যা করেছিল, ইংরেজরা ভারতবর্ষে সেই একই কাজ করলো— ভারতবর্ষের সংস্কৃতে লিখিত পুঁথিগুলির অনুবাদ এবং ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিনাশসাধন।

একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে ভারতবাসীকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কাজে নেমে পড়লো মিশনারিরা আর অন্যদিকে ভারতীয় জ্ঞান পাচার হতে থাকলো ইউরোপে।

আমরা দেখলাম, ভারতবর্ষ থেকে সংস্কৃতের পুঁথি পার্সিয়াতে অনুবাদ হয়। ব্যাত-আল-হাকিমাতে পার্সিয়া থেকে আরবি, আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় টলেডো লাইব্রেরিতে। জ্ঞান-চর্চার জন্য প্রয়োজন একটি সুগঠিত সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে আর্য-আক্রমণ তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ হওয়ার পর ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকে না। বৈদিক সভ্যতার সময়কালে পৃথিবীর অন্যত্র বৈদিক সভ্যতার সমতুল্য জ্ঞানচর্চা হয়েছে কি না তা গবেষণার বিষয়। কিন্তু ভারতবর্ষ-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সভ্যতা এবং তার জ্ঞান-চর্চাকে বিঘ্নিত করে যারা ক্ষমতাশালী হয়েছে, তারা মানবসভ্যতাকে পিছনের দিকেই নিয়ে গিয়েছে।

আমরা সেইদিনের অপেক্ষায় নেই যেদিন বিশ্ব ভারতবর্ষের কৃতিত্বকে স্বীকার করবে, আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম যেদিন ভারতবর্ষ নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতিকে সগৌরবে বাস্তবায়িত করবে।

ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে ধন-সম্পদের মতো জ্ঞান-সম্পদের প্রবাহের অভিমুখ ঠিক করে কোনো একটি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ শক্তি। জ্ঞানকে রক্ষা করতেও প্রয়োজন শক্তির। এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী সমাজ গঠনের মাধ্যমেই জ্ঞানচর্চা ও সেই জ্ঞানকে রক্ষা করা সম্ভব। ◻

পশ্চিমে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের চর্চা হয় না

দীপক খাঁ

বর্তমানে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, শরীর বিজ্ঞানের বিষয়ে পাঠদান করা হয়। সেই হিসেবে চেতনার বিভিন্ন অবস্থা যেমন— সংবেদন, আবেগ, ভাব, বৈদ্ধিক ক্রিয়া প্রভৃতিকে বর্ণনা করা হয় মনোবিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে। তাছাড়াও যেসব বহির্জাগতিক কারণে চৈতন্যে এইসব অবস্থাগুলি উৎপন্ন হয়, শারীরতাত্ত্বিক যেসব অবস্থায় সেসবের উদ্ভব হয়, সেগুলিকেও খুঁজে বের করা বিজ্ঞানের কাজ।

আমরা ভুলে যেতেই বসেছি যে, সাইকোলজি শব্দটি গ্রিক শব্দ সাইকি থেকে উদ্ভূত। 'সাইকি' শব্দের অর্থ হলো 'আত্মা'। আমরা বর্তমানে সাইকোলজি অর্থে আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করি না, কিন্তু আমরা মনের শারীরতাত্ত্বিক উৎস ও বিন্যাসকরণের উপর জোর দিই।

শারীরবিদ্যা ভিত্তিক মনোবিজ্ঞান সেই একইরকম ভাবে মস্তিষ্কের কোষের অন্তর্গত জড় পদার্থ কণাগুলির বিভিন্ন ধরনের গতি বা কম্পনকেই চেতনা বলে অভিহিত করে এবং চৈতন্যের প্রতিটি অবস্থাকেই মস্তিষ্কের কোনো না কোনো অংশের একটি সক্রিয়তা হিসেবে বর্ণনা করে। অর্থাৎ মস্তিষ্ক কোষের বিশেষ কম্পন অথবা সূক্ষ্ম অভিগতিকেই চেতনা বা সংবেদন অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, যখন আমরা কোনো বর্ণ দেখি আমাদের মস্তিষ্কের Occipital Convolution তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে। যখন গান শুনি তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে Temporal তাল ও লয় সংক্রান্ত কর্ণপট। এই সবই চিকিৎসাবিজ্ঞানীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত, যাঁরা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থাকেই নানাবিধ ব্যাধির উৎস বলে মনে করে। এরপর এঁরা বলেন 'আগম' ও 'নিগম' স্নায়ুগুচ্ছের কথা— যাদের মধ্য দিয়ে স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্কের মধ্যে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক থেকে শরীরের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের বলা হয় ঐন্দ্রিয়িক ও গতি-সঞ্চালক স্নায়ু। শারীরবিজ্ঞানীরা কিন্তু সংবেদন কী তার সংজ্ঞা দিতে পারে না। একে 'প্রকৃতির রহস্য' আখ্যা দিয়েই শেষ করে। শেষ বিচারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। অস্থির স্নায়বিক অবস্থা কীভাবে একটি স্থায়ী ও স্থির অনুরূপ অনুভূতি, চিন্তা, সংবেদন, প্রত্যক্ষণ বা ধারণা মনসত্তার মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে এটা ব্যাখ্যা করা যায় না। 'রহস্যাবৃত' বলে একে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গদি কেবল গতিরই সৃষ্টি করে। চেতনা গতি নয়, কিন্তু গতির জ্ঞাতা, মস্তিষ্কের যান্ত্রিক ক্রিয়া (যা গতিরই নামান্তর) কীভাবে তাকে উৎপন্ন করতে পারে? জার্মানির লিপজিকের অধ্যাপক ডাবলিউ উনড্-এর গবেষণার সূত্র ধরে ইয়েল মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষাগারের ডিরেক্টর 'ই' ডবলিউ স্ক্রিপচার, কিছু যন্ত্রভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে 'দ্য নিউ সাইকোলজি' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কোনো সুখরর বা কষ্টকর অনুভূতির সময়ে স্নায়ু প্রবাহের পরিমাপ কীভাবে করতে হয় তা এই গ্রন্থে বর্ণিত। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয় সংবেদন স্থান ও কালানুযায়ী কেমন হয় তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে অনুধাবন করে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই যদি হয়, তবে প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি কী হবে তাও জানা দরকার।

এই প্রশ্নটা স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে—

যা প্রকৃত মনস্তত্ত্ব, তা শুধুমাত্র মস্তিষ্ক, স্নায়ু বা স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মনের সম্বন্ধের কথাই আমাদের বলবে না, পরন্তু মনের স্বরূপ মানসিক সত্তা, তার পরিধি, সম্পর্ক, তার অবিচ্ছিন্নতা— এসব সম্পর্কেও আলোকপাত করবে। এটি অধিবিদ্যায় নয়, মনোবিষয়ক দর্শন নয়, এটাই হলো সাইকি বা আত্মার বিজ্ঞান— সত্যই যাঁর ভিত্তি। আমরা যখন আত্মা বা সাইকি সম্বন্ধীয় সত্যগুলির শ্রেণীকরণ ও সামান্যকরণ বুঝি— সেটাই হলো প্রকৃত মনস্তত্ত্ব। প্রকৃত মনোবিজ্ঞান শরীর, মন ও আত্মার বিশ্লেষণ করবে। কিন্তু, সমসাময়িক শারীর-মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র শরীরের অস্তিত্বকেই মানে, আর কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে আনে না।

আধুনিক শারীর-মনোবিজ্ঞান দেহাতিরিক্ত মন ও আত্মার কোনো অস্তিত্বই স্বীকার করে না। কিন্তু প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের মতে আমাদের ভৌতিক শরীর আত্মার আবাসভূমি। সমস্ত বুদ্ধি ও আত্মচৈতন্যের অধিকারী আত্মনই এই শরীরের স্রষ্টা। এই সত্তা ভৌতিক, জৈব মানসিক ও বৌদ্ধিক সত্তার অতি ঊর্ধ্বে। প্রকৃত মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনকে আত্মিক ও বাহ্যিক এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মিক মন হলো সেই মাধ্যম যা মস্তিষ্ক ও বাহ্যজগতের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত বাহ্যিক মনকে বোধি সরবরাহ করে জ্ঞানেন্দ্রিয়দের সাহায্যে। অপর পক্ষে, বাহ্যিক মন বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে এবং 'বিবিধ বোধের' সৃষ্টি করে। আত্মিকমন সংবেদনলব্ধ উপাত্তগুলিকে অর্থবহ করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মন একই। এক মনেরই আত্মিক ও বাহ্যিক--- এই দুই অবস্থাভেদ। আত্মিক অবস্থায় মন আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আর বাহ্যিক মনের সম্বন্ধ মস্তিষ্কের সঙ্গে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারপথে বাহ্যিকমন বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসে যে ভৌত পরিবেশে যে বাস করে তার সম্পর্কে নানা তথ্য গ্রহণ করে এবং ওই তথ্যগুলি আত্মার কাছে উপস্থাপন করে— তখন আত্মাকে জ্ঞাতা নামে অভিহিত করা হয়। মন রূপ 'করণ' যদি না থাকতো, তাহলে আত্মা হতো দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন ও স্পর্শহীন— অর্থাৎ বহির্জগতের বিবিধ তথ্য গ্রহণ করবার কোনো পথ থাকতো না। মস্তিষ্ক তখন বর্ণ, শব্দ প্রভৃতি গ্রহণ করতে থাকলেও এইসব বিষয়ের কোনো সংবেদন পাওয়া সম্ভব হতো না— যেমনটি হয় শবদেহের ক্ষেত্রে। মস্তিষ্কের সঙ্গে যদি মনের সংযোগ না থাকে তাহলে ব্যক্তির আত্মা এই সব প্রত্যক্ষণের বিষয় অর্থাৎ বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা অনুভূতি— এসব কিছুই প্রত্যক্ষণ করবে না।

নিদ্রার এক প্রকার বিকার আছে, যাকে বলা হয় নিদ্রাচলন (Somnambulism) [Somnos= নিদ্রা, ambulism— চলা বা খোরাফেরা করা] Hypnotic Sleep (সম্মোহিত নিদ্রাবস্থা)। নিদ্রার আরও এক প্রকার ভেদ আছে যাকে অর্ধজাগ্রত অবস্থাও বলা চলে। এই দুই অবস্থাতেই আত্মিক মন বৈষয়িক মন ব্যতিরেকেই কাজ করে যেতে পারে। আত্মিক মনের এক বিশেষ শক্তি আছে। এই আত্মিক মনকে নানাভাবে বাইরে থেকে নির্দেশ দিয়ে প্রভাবিত করা যেতে পারে (Auto-Suggestion)। এখানে বলা যেতে পারে স্বনির্দেশ নিজের ভেতর থেকে নির্দেশে, বাইরের যে কোনো নির্দেশের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। নবজাত শিশু প্রথমে পুরোপুরি আত্মিক মনের অধিকারী; পরে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আলোকে বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ হয়।

আত্মিক মনের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখা যায়। নিদ্রাবস্থায় অথবা যখন বৈষয়িক মনকে সাময়িক কার্য থেকে বিরত রাখা যায়, সে অবস্থায় বহু বিষয়ের সুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়ে ওঠে। এমনকী পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগরুক হওয়াও সম্ভব। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগরণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। কর্নেল ভি. বকাস্ একটি মেয়েকে সম্মোহিত করলে তাঁর পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগরুক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আত্মিক মন কখনও নিদ্রিত হয় না। সদা জাগরুক থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার অধিকারী পুরুষ-নারী যেসব আবিষ্কার করেন সবই এই আত্মিক মনের বিকিরণ। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অবশ্য বৈষয়িক মনের কাজ। অস্বাভাবিক কামনা অথবা ক্ষুধা অবচেতন মনে অবস্থান করে। আত্মিক মনকে যথাযথ নির্দেশ দিলে এর নিরসন হতে পারে। রোগ নিরাময়ের বিশেষ শক্তি এই আত্মিক মন থেকেই উদ্ভূত।

মানবমনের ধর্ম সীমাবদ্ধতার সূচক এবং স্বভাবতই স্থূলসত্তার নিয়মানুযায়ী চালিত হয়। আমাদের মনের প্রথম ধর্ম হলো— কল্পনা শক্তি। এটি সম্ভব, অসম্ভব নানারূপ পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করার শক্তি বিশেষ। এই বিশেষ শক্তির সাহায্যে মনের অন্যান্য ধর্মের আবির্ভাব। মনের অপর একটি ধর্ম হলো বিচার শক্তি অথবা তুলনা করার শক্তি। বিশ্লেষণ বলতে কোনো এক জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে অপর জ্ঞাত বিষয়ের তুলনা করার শক্তি। যখন বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে কল্পনা যুক্ত হয়, তখন আমরা একে অনুমান অথবা উৎপাদন বলি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেখানেই আমরা ধূম দেখি এবং অগ্নির সঙ্গে তুলনা করি, তখন অনুমান সিদ্ধ হয়। কাজেই অনুমান মানেই বিশ্লেষণ ও তুলনা, তার সঙ্গে জুড়ে যায় কল্পনা।

মনের পর এক ধর্ম সিদ্ধান্তকরণ এবং তা অনুমান থেকে পৃথক। এটা হলো কারণ থেকে কার্যের অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানার প্রক্রিয়া। যেমন, যেখানে খুব বেশি বৃষ্টিপাতের পর আমরা নদীসমূহের স্ফীতির সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিক থাকে তাহলে আমাদের ভুল হবে না এবং আমরা বৈষয়িক মনের প্রত্যক্ষ ধারণার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু আত্মিক মনের প্রত্যক্ষ বা তাৎক্ষণিক ধারণাকে আমরা Intuition অথবা অপরোক্ষানুভূতি বলে থাকি। মনের এই বিশেষ ধর্ম— আমাদের মনের সঙ্গে আত্মার বিশেষ সম্বন্ধের কথাই প্রমাণ করে। কারণ, আত্মাই হলো সকল প্রকার চৈতন্যের উৎসস্বরূপ।

প্রকৃত মনোবিজ্ঞানকে যথাযথ কার্যকরী করতে পারলেই মনের বিবিধ শক্তি ও ধর্মের ব্যাখ্যা মিলবে। যেমন— নির্দেশ, চিত্তসঞ্চালন (টেলিপ্যাথি), সম্মোহন অথবা মনঃশক্তির দ্বারা রোগ নিরাময়। আরও বহুবিধ শক্তির কথা আমরা জানি, শারীর মনোবিজ্ঞান পড়ানো হয় তাতে এসব ব্যাপারকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এসব তাই পড়ানো হয় না। আর এসব ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য মাথা ঘামানো হয় না, কার্যত বর্জনই করা হয়। কিন্তু, প্রকৃত মনোবিজ্ঞান এসব অগ্রাহ্য করে না। পশ্চিমি দেশে প্রকৃত মনোবিজ্ঞান চর্চাই নেই। কিন্তু, প্রাচ্যে এ বিষয়ে শিক্ষণের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানে এই সকল মানসিক প্রসঙ্গের একটা ব্যাখ্যা মেলে এবং গবেষণামূলক সংস্থায় তা অনুসৃত হয়। তাছাড়াও প্রেতবাদের সত্যতা ব্যাখ্যা করে, সেসব সত্য কম-বেশি আত্মিক মনের মানসিক শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অবশ্য এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন যারা, তাঁরা মন বলতে আমরা যাকে আত্মা বলছি তাকেই বোঝাতে চান। ▯

ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে অতীতের ঔজ্জ্বল্য

কৌশিক রায়

ভারতীয় ব্যাডমিন্টন বলতে আমরা প্রায় সকলেই আজকাল বুঝি ওলিম্পিক্সে পদক বিজয়িনী পিভি সিন্ধু আর সাইনা নেহাওয়ালের কৃতিত্বকে। তবে, ১৮৯৯ সালে শুরু হওয়া বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 'অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ' প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে গৌরবপতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরা তিনজন খেলোয়াড়— প্রকাশ নাথ, প্রকাশ বাড়ুকোন আর সৈয়দ 'মোদী'র নাম বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম স্যুই কিং, রুডি হারতোনা, ধানি সারতিকা, ইংল্যান্ডের ডেরেক ট্যালবট আর ডেনমার্কের মর্টেন ফ্রস্ট হ্যানসেনদের মতো সামনের সারির তারকাদেরকে হেলায় হারিয়ে গোটা ব্যাডমিন্টন দুনিয়াতে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিলেন বর্তমান বলিউড চিত্রতারকা দীপিকা পাড়ুকোনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকোন। আরও দুটি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা— টমাস কাপ (পুরুষ) ও উবের কাপেও (মহিলা) ভারতের ব্যাডমিন্টন অতীতে অনেকবারই স্বাধীনতার বছরেই ১৯৪৭ সালে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে একটি বড়ো সাফল্য এনে দেন মহারাষ্ট্রের বিজয় মাদগাভকার।

অল-ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পুরুষ বিভাগে রানার্সআপ হন তিনি। এই সময়ে মহিলা ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে নাম করেছিলেন তারা দেওধর, মুমতাজ চিনয়, সুন্দারা দেওধর ও ফ্রেনি তালেওয়ার খান। পুরুষ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে এইসময় পাদপ্রদীপের আলোতে উঠে আসেন নান্দু নাটেকার, জর্জ লিউয়িস, খাণ্ডু রাঙ্গেকার, দাত্তুমুগুয়ে ও রাজা পটবর্ধন। একসময় বিশ্ব ব্যাডমিন্টন শীর্ষবাছাইতে ৪ নম্বর স্থানে ছিলেন নান্দু নাটেকার। ১৯৫৬ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে সেলাংগার ইন্টারন্যাশানাল টুর্নামেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলসে জয়লাভ করেন তিনি। ব্যাংককের কিংসকাপের মিক্সড ডাবলসেও জেতেন নান্দু নাটেকার ও মীনা শ'। অসাধারণ রিটার্ন সার্ভিসের সাহায্যে ১৯৬৫ সালে লক্ষ্ণৌতে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জেতেন দীনেশ খান্না। জামাইকার

নান্দু নাটেকর

কিংসটনে ১৯৬৬ সালে আয়োজিত কমনওয়েলথ গেমসেও ব্রোঞ্জ পদক জেতেন দীনেশ। তাঁকে বলা হতো 'দ্য রিটার্নিং মেশিন'।

ইন্দোনেশিয়ার 'বাঘিনী' নামে খ্যাতা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়— সুসি সুশান্তির খেলার সঙ্গে মিল ছিল দীনেশ খান্নার। ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৪-৫৫ সালে টমাস কাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ডেনমার্কের সঙ্গে প্রবল লড়াই করে পরাজিত হন ভারতের নান্দু নাটেকার, ত্রিলোক নাথ শেঠ মনোজ গুহ, অমৃত দেওয়ান ও গজানন হেম্মাদি। ১৯৭২-৭৩ সালেও টমাস রূপে কানাডার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৪-৫ সেটে পরাস্ত হন ভারতীয়রা। উবের কাপে ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব ততটা বেশি না হলেও ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত মুমতাজ লোটওয়ালা, সুমন আথাভালে, সুশীলা কাপাডিয়া, আমি ঘিয়ারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ভারতের হয়ে ৬ বার ব্যাডমিন্টনে জাতীয় প্রতিযোগিতা জেতেন আমি ঘিয়া। ১৯৭৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জপদক জয় করেন পঞ্জাবের কানওয়াল ঠাকুর সিংহ। তবে, এই সময়ে ভারতীয় মহিলা প্লেয়ারদেরকে যথেষ্ট চাপে রেখেছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ইমেলদা উইগোয়েনো, বীরাবতী এবং ইংল্যান্ডের কারেন ব্রিজ ও স্যালি লিড।

১৯৮১ সালে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি ফাইনালে ডেনমার্কের মিশায়েল কিয়েলডসেনকে দারুণ খেলে হারালেন সৈয়দ মোদী। ফাইন্যালে অবশ্য তাঁকে লিয়েম স্যুই কিঙের কাছে হারতে হয়। দুর্ঘটনায় অকালপ্রয়াত না হলে প্রকাশ পাড়ুকোনের মতোই সুবিখ্যাত হতে পারতেন সৈয়দ মোদী। ডেনমার্কের জোরালো

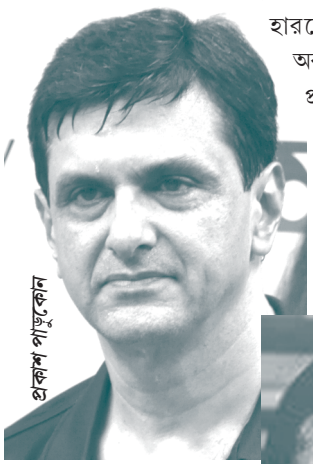

প্রকাশ পাড়ুকোন

স্ম্যাশ ও ব্যাকহ্যান্ডে পারদর্শিনী কিরস্টেন লারসেনকে হারিয়েছিলেন আমি ঘিয়া। ১৯৮১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়াতে প্রকাশ পাড়ুকোনকে হারিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন সৈয়দ মোদী। স্ট্রেট সেটে যে আনকোরা মোদীর কাছে হেরে যাবেন—

আমি ঘিয়া

সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি প্রকাশ। প্রায় ওই সময়েই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুই পায়ে অসহ্য ব্যথা নিয়েও কিম হিউজেস, ডগলাস ওয়াল্টার্স, গ্রাহাম ইয়ালপদের মতো বাঘা ব্যাটসম্যানদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্রিকেটেও ভারতের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন হরিয়ানা হারিকেন কপিলদেব নিখাঞ্জ। ১৯৭৬ সালে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী, ডেনমার্কের স্যোয়েন্ডি প্রি-কে লন্ডনের রয়্যাল অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত মাস্টার্স টুর্নামেন্টে পরাস্ত করেন প্রকাশ পাড়ুকোন। এরপর অবশ্য ইন্দোনেশিয়ার হাদিয়ান্তো, লিউস পোংগো এবং ইকাক সুগিয়ার্তোর সামনে নিজের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সকে আর ধরে রাখতে পারেননি প্রকাশ। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের সেই অস্তমিত গৌরববরবিকে কিছুটা ফেরাতে পেরেছিলেন পুল্লেলা গোপীচাঁদ। আশা করা যাচ্ছে— তাঁর দুই শিষ্যা— সিন্ধু-সাইনা আবার ভারতের 'ব্যাডমিন্টন ভাস্করকে' খ্যাতির মধ্যগগনে তুলে ধরতে পারবেন। ◻

সকলের মা সারদা

বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ডগ্রাম জয়রামবাটি। এখানকার এক সাধারণ ব্রাহ্মণের কন্যা সারদামণি। পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী– সকলের মা সারদা। এই মহাজীবনের আবির্ভাব ও প্রকাশ জগতে এক অনন্যসাধারণ অলৌকিক ঘটনা।

অতি সামান্য গ্রাম্য জীবনের চালচিত্র। ছোট্টো মেয়ে সারদা চলেছেন গোরুর জন্য দলঘাস কেটে আনতে। মুনিষের জন্য মুড়ি নিয়ে জমিতে চলেছেন দুপুরবেলা। আবার দেখা যেত তাঁকে জমিতে গিয়ে পঙ্গপালে কেটে দেওয়া ধান কুড়োতে। পইতেও কেটেছেন। বাড়িতে মা-বাবা, খুড়ো-জেঠাদের সেবা-যত্নও করতেন। ছোটো ভাই-বোনেদের দেখাশোনা করতেন বালিকা সারদা। স্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি সারদামণি। পূজা-পার্বণ, যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি সহজ সচল মাধ্যমগুলোর মধ্য দিয়ে তিনি ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ প্রভৃতির পাঠ নিয়েছিলেন। নির্ভীকতা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণসমূহ বাল্যকালেই তিনি আয়ত্ত করেন। সরল জীবনযাত্রা ও গ্রাম্য উদার প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে তৈরি করেছিলেন।

তখন সারদামণি নিতান্তই বালিকা। এলাকায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। না-খেতে পাওয়া কত মানুষ দলে দলে তাদের বাড়িতে আসে দুটো অন্নের আশায়। আগের বছরের জমির ধান রয়েছে মরাই বাঁধা। তাঁর বাবা মরাই খুলে দিয়েছিলেন। কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রেঁধে সবাইকে খাওয়াতেন। সারদা গরম খিচুড়ি জুড়িয়ে দেবার জন্য ঘুরে ঘুরে পাতে পাতে পাখার বাতাস করতেন। ওইটুকু বয়সে মানুষের প্রতি কত স্নেহ, কত মায়া! রামচন্দ্র মুখুজ্জের কন্যা সারদার মাতৃভাবের রূপ এভাবেই ফুটে উঠতে থাকে বাল্য-কৈশোরের ফাঁকে ফাঁকে।

বিয়ের পর সারদামণির সঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণের দেখা হয় সাত বছর বয়সে, তারপর তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে। এরপর ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। বিভিন্ন ধারার সাধনায় ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের অদূরে পঞ্চবটিতে ধ্যানে বিভোর হয়ে আছেন। এদিকে জয়রামবাটিতে গ্রামের মানুষের নিন্দা-মন্দ, স্বামী সম্বন্ধে কুরটনা সবই সারদার কানে আসে–নীরবে সহ্য করেন তিনি। স্বামীর কাছে থেকে তাঁর সেবা-যত্ন করবেন মনস্থির করে একদিন বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। ঠাকুরের সেবা ও সাধনায় মন-প্রাণ সঁপে দিলেন। ঠাকুরের দিব্যদৃষ্টিতে মা সারদার ভবিষ্যৎ কর্মধারাটি ধরা পড়েছিল। তাঁর অবর্তমানে সঙ্ঘ-জননীরূপে মা সারদার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের পটভূমি তৈরি করেই যান। তিনি মাকে একদিন বলেন, তোমায় এমন সব রত্নতুল্য ছেলে দিয়ে যাবো, মাথা কুটে তপস্যা করেও মানুষ তা পায় না। মায়ের জন্ম হয়েছিল লক্ষ-কোটি আগত ও অনাগত সন্তানের মা হবার জন্য। ঠাকুর গভীর স্নেহ ও সম্ভ্রমের চোখে মাকে দেখতেন। তিনি সারদা মাকে জগজ্জননীরূপে পূজা করে নারীশক্তির মহিমা ও সম্মানের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। তিনি এক সময় মাকে বলেছিলেন, 'কলকাতার লোকগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখবে।'

ঠাকুর দেহ রাখার পর শ্রীশ্রীমা তীর্থভ্রমণে বের হন। ফিরে এসে তিনি কামারপুকুরে যান। সেখানে তাঁর কষ্টের যে জীবনযাত্রা তা বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি করে। তার মধ্যেই সকলের জন্য কর্তব্য পালনে তাঁর মাতৃভাবের এক অপূর্ব মূর্তি প্রকাশ পায়। প্রচলিত বাহ্যিক দৃষ্টিতে মা ছিলেন অশিক্ষিতা ও অন্তঃপুরবাসিনী। কিন্তু তাঁর ভিতরে এমন ঐশীশক্তি বিরাজ করত যে বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দও মায়ের পদতলে শিশুর মতো বসে থাকতেন। স্বামীজীর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা একমাত্র দূর করতে পারতেন মা। তিনি অপার মাতৃস্নেহে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে ধরে রেখেছেন। ত্যাগী সন্তানদের স্বাস্থ্যের কথা মনে রেখে মা তাদের মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। বিপ্লবীদলে কাজ করা তিনজন রামকৃষ্ণ মঠে যোগ দেন। বড়লাট সাহেব অভিযোগ জানালেও মা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে সন্তানদের আশ্রয় দেন।

মা যেখানেই থাকতেন সেখানেই ভক্ত সন্তানদের ভিড় লেগে থাকত। মা সকলকে যত্ন করে খাওয়াতেন। খাওয়ার পরে নিজ হাতে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন। কেউ অভিযোগ করলে বলতেন আমি যে মা। ছেলের এঁটো মা নেবে না তো কে নেবে? সন্তান বা ভক্তের জাত নেই। আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।

সনাতন ভারতীয় নারীর প্রতিমূর্তি মা। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহনশীলতা, উদারতা, স্নেহ, বাৎসল্য সকল ভাবের দিক থেকে মা অতুলনীয়া– 'বিশ্বসভায় ভারতীয় সভ্যতার অমূল্য উপহার'। তিনি আদর্শ জননী, জায়া, কন্যা, ভগিনী ও আচার্যা। কত শত সন্তান মায়ের স্নেহ-ছায়াতলে জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছেন। তাই তো তিনি সকলের মা–আরাধ্যা জননী।

(শাশ্বত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

দীনেশ গুপ্ত

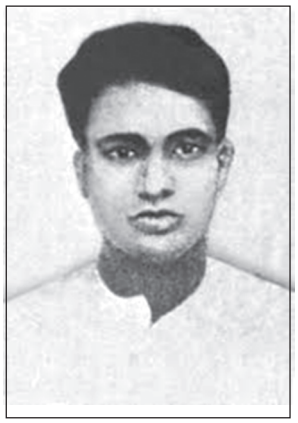

দীনেশ গুপ্তের জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার যশোলঙে। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, বেপরোয়া ও বাগ্মী। এই সময় থেকেই তাঁর মনে স্বদেশ চেতনা ও দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিনয় বসুর নেতৃত্বে তিনি ও বাদল (সুধীর গুপ্ত) রাইটার্স বিল্ডিঙে কারা বিভাগের অত্যাচারী ইনসপেক্টর সিম্পসনকে হত্যা করার পর তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর কাছ থেকে খবর বের করার জন্য তাঁকে সুস্থ করে তোলে। নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর তারা বের করতে পারেনি। প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- বাদুড় মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে।
- বোলতা ও পিঁপড়ের কামড়ে ফরমিক অ্যাসিড থাকে।
- ব্যায়ামবীর মনোহর আইচকে 'পকেট হারকিউলিস' বলা হতো ।
- লালা লাজপত রাই 'শের-ই-পঞ্জাব' নামে পরিচিত ছিলেন।
- ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস কিরণ বেদী।
- বাউল সম্রাট পূর্ণচন্দ্র দাস 'তুলসী সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হন।

ভালো কথা

ভক্ত বাঁদর

কয়েক বছর আগে আমরা সপরিবারে তারাপীঠ গিয়েছিলাম। রাত্রিতে হোটেলে থেকে পরদিন সকালে প্রথমেই আমরা মায়ের পুজো দিলাম। জেঠু ভোগের ঝুড়িটি একটা নতুন রুমালে বেঁধে হাতে নিলেন। তারপর সবাই মিলে মহাশ্মশান দেখতে শুরু করলাম। শ্মশানে ঢোকামাত্র একটি বাঁদর জেঠুর হাত থেকে প্রসাদের ঝুড়িটা নিয়ে গেল। জেঠু বলল বাঁদরে প্রসাদ নিয়ে গেলে শুভ হয়। অনেক সময় ধরে আমরা পঞ্চমুণ্ডির আসন, বামাখেপার কুটির সব দেখে ফিরে আসছি, এমন সময় একটি বাঁদর জেঠুর মাথায় রুমালটি ফেলে দিল। মা বলল ওই বাঁদরটিই নিয়ে গিয়েছিল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, রুমালটি অক্ষত। জেঠু বললে দেখলি কেমন ভক্ত বাঁদর, প্রসাদ খেল আর রুমালও ফেরত দিল।

যুথিকা দাস, দ্বাদশ শ্রেণী, ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল ম ত হী	(১) দ মু মা দ্র প্র ন
(২) ন ত সা কা	(২) ন স লী প্তা কা হ

৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) অজ্ঞাতপরিচয় (২) নেপথ্যসংলাপ

৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) হস্তনির্মিত (২) মৃতসঞ্জীবনী

উত্তরদাতার নাম
(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদমপুর, মালদা। (২) সুকর্ণা দেব, গঙ্গারামপুর, দঃ দিঃ
(৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯ (৪) শুভম সরকার, বেলঘড়িয়া, কল-৫৬।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

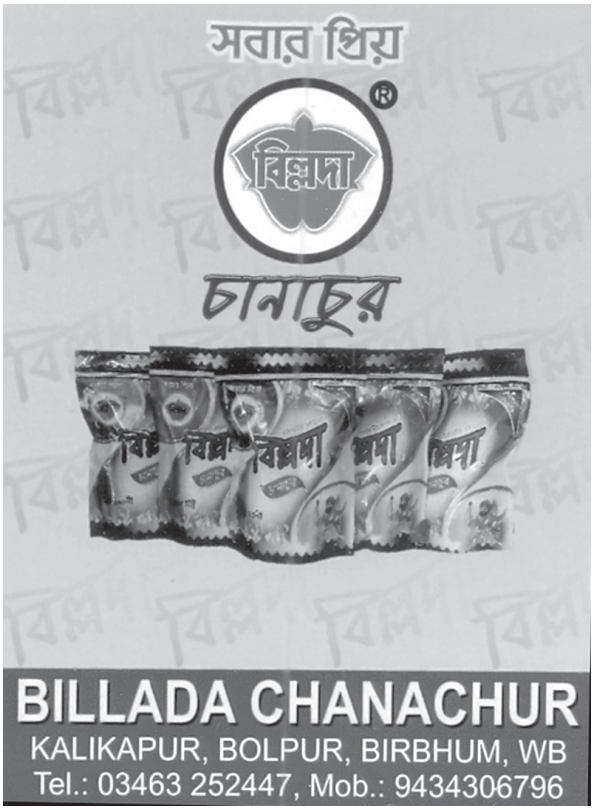

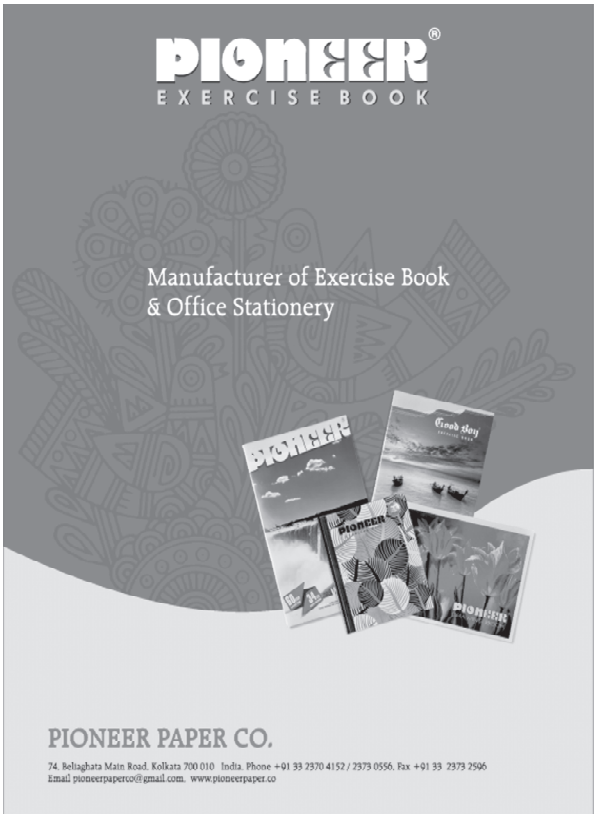

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বালোচরা জীবন দিয়ে বুঝেছে পাকিস্তান কোনো সভ্য দেশ নয়

দুর্গাপদ ঘোষ

বালুচিস্তানের মানুষের কাছে ২৭ মার্চ হলো 'পরাধীনতা দিবস'। দিনটা তাদের কাছে কেবল শারীরিকই নয়, মানসিক যন্ত্রণার দিনও। সাত দশক আগে এই দিনেই সেনাবাহিনীর বেয়নটের খোঁচা আর বন্দুকের নলের মুখে বালুচিস্তান দখল করে নিয়েছে পাকিস্তান। তার আগে কাগজে-কলমে এলাকাটা পাকিস্তানভুক্ত হলেও কার্যত বালোচরা ছিল স্বাধীন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা বালুচিস্তানকে পাকভুক্ত করলেও বালোচরা তা মেনে নেননি। এখনো বালোচদের সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে আসছে।

গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ৭৬ তম সাধারণ অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এবারের এই সাধারণ সভায় অনেকগুলি আলোচ্য বিষয় থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুত সন্ত্রাসবাদের আগুনের তাপে নিষ্প্রভ থেকে গেছে। সব বিষয় ছাপিয়ে গিয়ে সামনে চলে এসেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিষয়। উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, পাকিস্তান আগের মতো ভারতভুক্ত কাশ্মীর নিয়ে পুরনো গতে সানাই বাজাতে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতের কুশলী কুটনীতিক তথা ফার্স্ট সেক্রেটারি স্নেহা দুবের চাঁচাছোলা বক্তব্যে তা ধোপে টেকেনি। নরেন্দ্র মোদী বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে শুনিয়ে দিয়েছেন যে কাশ্মীরে ভারতের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কোনও কথা বলার অধিকার পাকিস্তান বা অন্য কারও নেই। কাশ্মীর নিয়ে মুখ খোলার আগে 'পাকিস্তান জবরদখল করে রাখা কাশ্মীর ছেড়ে চলে যাক' বলে জোরালো দাবিও করেছেন। অধিবেশন চলাকালীন আরও দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। একদিন কাশ্মীরি পণ্ডিত বা কাশ্মীরি হিন্দুরা, অন্যদিন বালুচিস্তানিরা প্ল্যাকার্ড, ফ্লেক্স, ব্যানার নিয়ে সভাস্থলের বাইরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী দেশ ঘোষণার দাবিও তুলেছেন।

পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর-সহ সারা ভারতে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসের ভয়াবহ রূপ আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করছি। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে বালুচিস্তানে পাকিস্তান যে নৃশংস সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তার খবরাখবর বিশ্বদরবারে খুব কমই পৌঁছয়। কারণ বালোচরা কোনও রাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। কেবলমাত্র ব্যানার, ফেস্টুন, ফ্লেক্স আর প্রতিবাদী স্লোগান তাদের সঙ্গী, তাদের বক্তব্যের ভরসা। পাকিস্তান অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে কুৎসা রটানোর চেষ্টা চালিয়ে থাকে। অথচ তারা পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও বালুচিস্তানে যেভাবে তা লঙ্ঘন করে চলেছে তা নিয়ে বিশ্ববাসীর নজর আকর্ষণ করাটা মনে হয় এখন সত্যিই খুব জরুরি। এই প্রতিবেদন মুখ্যত বালুচিস্তানকেন্দ্রিক। তাই এখানে বালোচদের যন্ত্রণা নিয়ে কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা

ফঃ ৬

হলো। মনে হয় তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে পাকিস্তান কোনও সভ্য দেশের পর্যায়ে পড়ে না। অন্তত তাদের মুখে মানবাধিকার শব্দটা একেবারেই বেমানান।

২০০৬ সালে জেঃ পারভেজ মোশারফ পাকিস্তানের সেনাশাসক থাকাকালে বালোচদের নেতা নবাব আকবর বুগতিকে একটা পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে পাক সেনারা। মোশারফ বালোচদের আন্দোলন চিরতরে বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা নিয়ে এই হত্যা করিয়েছিলেন বলে মনে করে বালোচরা। মোশারফ ভেবেছিলেন নবাব আকবরকে সরিয়ে দিলেই বালোচদের প্রতিবাদ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে বালোচ বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নেয়। সমগ্র বালুচিস্তানে বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন 'পূর্ণ স্বাধীনতা' সংগ্রামে বদলে যায়। বালোচদের প্রতিবাদী হাতের মুঠো নীচে নামাতে, সোচ্চার কণ্ঠ স্তব্ধ করাতে আরও বেশি মাত্রায় রক্ত ঝরানো শুরু করে পাকিস্তান। নিহত বুগতির দিদি এবং তাঁর বারো বছরের ভাগ্নীকে ২০১২ সালে করাচিতে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়। আইএসআই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল বলে অভিযোগ উঠলেও আজ পর্যন্ত তার কোনো কিনারা তো দূর, বিচার পর্যন্ত হয়নি।

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনার উপস্থিতিকালে মাঝে মাঝেই মার্কিন ড্রোন থেকে পাক তালিবানদের ওপর গুলি-বোমা বর্ষণ হলে তালিবানরা বালুচিস্তান ও পাশতুনখাওয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ত এবং সেখানে তাণ্ডব চালাত। পাক সেনা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নামে বালোচ ও পাশতুনদের ওপর নির্যাতন চালাত। বালোচরা প্রতিরোধ নামলে তাদের ওপর দমনপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এভাবে নানা বাহানায় প্রতিনিয়ত পাকসেনার পৈশাচিক বর্বরতার শিকার হয়ে আসছেন বালোচরা।

মাত্র পাঁচবছর আগের কথা। ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। বালুচিস্তানের বুকে সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। শীতের ঠাণ্ডা আমেজে আড়মোড়া ভাঙছেন ডেরা বুগতি জেলার গৈন্ধরী গ্রামের মানুষ। এমন সময় কান ফাটানো আওয়াজ করতে করতে আকাশপথে ধেয়ে এল যমদূতের মতো ১০ খানা পাকিস্তানি বেল হেলিকপ্টার। শুরু করল এলোপাথারি গুলি ও বোমাবর্ষণ। সেই সঙ্গে তালিবান জঙ্গিদের মতো পাকসেনারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর। তাদের অপরাধটা যে কী তা জানার আগেই ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেওয়া হলো। একটানা তিনঘণ্টা ধরে চালিয়ে গেল গণহত্যা। বালোচদের ভাষায় 'সিস্টেমেটিক জেনোসাইড'। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা, শিশু কেউ বাদ যায়নি। তরুণী, যুবতীদের তুলে নিয়ে গেল পাকিস্তানি সেনা ছাউনিতে। প্রায় দেড় মাস পর ২২ অক্টোবর হেলিকপ্টার থেকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হলো শাম্পি বুগতি নামের এক বিবাহিতা মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ। মৃতদেহ কথা বলে না, তাই ঠিক কী কারণে ওই মহিলাকে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হয়েছিল তা আজও জানা যায়নি। তখন গৈন্ধরীতে তার মৃতদেহ সমাধি দেওয়ার মতো কেউ বেঁচে ছিল না। শাম্মির স্বামী, তার এক ছেলে ও এক মেয়েকে আগেই মেরে ফেলা হয়েছিল। বাকিরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে। কিন্তু ৯ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটানায় অন্তত ৩৪টি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এর একবছর পর সেপ্টেম্বর মাসে ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে শিউড়ে উঠেছিলেন বালোচ মানবাধিকার সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লা আব্বাস বালোচ। পাক সেনার হুমকিতে তাঁকে জার্মানিতে পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে।

ভারতবর্ষকে তিন খণ্ড করে পাকিস্তান নামক দেশটা আত্মপ্রকাশ করার ৮ বছর আগে ১৯৩৯ থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন বালোচরা। এখন নব প্রজন্মের বালোচরা সেই স্বাধীন বালাচের দাবিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য পাক সেনার মূল লক্ষ্য তরুণ-যুবক বালোচরা। তাদের ওপর পাকসেনার নির্যাতন চলছে মাত্রাছাড়াভাবে। ইতিমধ্যে বালুচিস্তানের এই মুক্তি সংগ্রামে যুক্ত হয়েছে নয় নয় করেও প্রায় এক ডজন সংস্থা, যাদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দলও আছে। যেমন বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ), বালোচ রিপাবলিকান আর্মি (বিআরএ), ইউনাইটেড বালোচ আর্মি (ইউবিএ), লস্কর-ই-বালুচিস্তান (এলইবি), বালুচিস্তান লিবারেশন ইউনাইটেড ফ্রন্ট (বিএলইউএফ) ইত্যাদি। ২০১৬ সালে জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকের সময় 'দ্য বালোচ হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অ্যান্ড পাশতুন'-এর সদস্যরা পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় বাইরে ব্যানার হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন রজ্জাক বালোচ নামের এক যুবক। সেই সময় বালুচিস্তানের মানবাধিকার কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক সামাদ বালোচ মন্তব্য করেছিলেন, ' পাকিস্তান হলো সন্ত্রাসবাদের প্রজনন ক্ষেত্র।' পাকিস্তানকে 'দুর্বৃত্ত দেশ' বলতেও বাকি রাখেননি। ২০২১-এর ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানের নাম না করে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে পাকিস্তানকে যেভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সেদিন জেনেভায় সরাসরি পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করেই সামাদ বালোচ সমগ্র বিশ্বকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, ' পাকিস্তান কেবলমাত্র বালোচ নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে মূর্তিমান ত্রাস।' মনে হয় এতটুকুও বাড়িয়ে বলেননি তিনি। আজ বালুচিস্তানের রুক্ষ্ম পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পচা-গলা কিংবা শুকিয়ে লেগে রয়েছে মানুষের মৃতদেহ। পাথরের গায়ে গায়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের কালচে দাগ। প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটছে বিপর্যয়। বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত প্রতিবাদী নবপ্রজন্মের বালোচদের। কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছেন তাঁরাই।

বালুচিস্তান পাকিস্তানের সবচাইতে বড়ো প্রদেশ শুধু নয়, আয়তনের দিক থেকে পাকিস্তানের প্রায় ৪৬ শতাংশ। কিন্তু প্রায় অর্ধেক পাকিস্তানের এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সরকারি সন্ত্রাস তথা গণহত্যার কথা বিশ্ববাসীর কাছে যাতে না পৌঁছয়, সেজন্য বিশ্বের কোনও সংবাদমাধ্যমকে সেখানে ঢোকার অনুমতি দেয় না পাক প্রশাসন। ফাঁকফোঁকর দিয়ে যেটুকু প্রকাশ্যে আসে তা ঘটনা ঘটে যাবার অনেক পরে। ফলে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তখন তা আর তেমন গুরুত্ব পায় না। ২৭ মার্চ দিনটা বালোচদের কাছে ভয়ানক যন্ত্রণার দিন। তাদের নিজেদের ভাষায় 'পরাধীনতা দিবস'। প্রায় ৭৪ বছর আগে এই তারিখেই বালুচিস্তান 'জবরদখল' করেছিল পাকসেনারা। সেখানকার শাসককে বন্দুকের নলের মুখে পাকিস্তানে যুক্ত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। পাকিস্তানের এই 'দখলদারি' থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য সেই থেকে বহাল রয়েছে বালোচদের মুক্তি সংগ্রাম। পূর্ব-পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন থাকায় ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য করতে পেরেছিল। কিন্তু মানবাধিকারবাদী ভারত বালুচিস্তানের কাছাকাছি পর্যন্ত না থাকায় তা করতে পারেনি বা পারছে না। ২০১৮ সালে 'বালুচ গান্ধী' বলে পরিচিত কাদির বালুচ দিল্লিতে এসে বলেছিলেন এত হিংসার সামনে অহিংস আন্দোলনে আর কোনও কাজ হচ্ছে না। লড়াই করতে করতে কখন যে

তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী হয়ে পড়েছেন তা হয়তো তিনি নিজেই বুঝতে পারেননি। ভারত সরকারকে বলেছিলেন, আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাতে লড়াই করতে পারি সেজন্য আমাদের অস্ত্র দিন। কিন্তু বালুচিস্তানের এক পাশে পাকিস্তান, অন্য পাশে আফগানিস্তান থাকায় ভারতের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। এবছরের মধ্য আগস্টে কাবুল পাক ক্ষমতাপুষ্ট তালিবান, হক্কানি ইত্যাদি জঙ্গিদের কবলে চলে যাওয়ায় বালোচদের অবস্থা যে আরও বেশি খারাপ হতে চলেছে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। দীর্ঘদিন ধরে বালোচদের মুক্তি সংগ্রামে আত্মবলি দিয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। নিখোঁজ হয়েছেন আরও বেশ কয়েক হাজার। তাদের পরিণতি অনুমানের অসাধ্য নয়।

ইতিহাস বলছে, বালুচ এলাকার চারটে স্বাধীন রাজ্য ব্রিটিশ শক্তির কাছে বশ্যতা মেনে নিয়ে করদ রাজ্য হলেও কোনও সময়ই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বিসর্জন দেয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মাঝরাতে পাকিস্তান নামে নতুন দেশ আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে শুরু হয় সমস্যা। বালুচিস্তানর যে অংশ ব্রিটিশদের হাতে ছিল যেই চারটে করদ রাজ্যের মধ্যে তিনটে রাজ্য – মাকরান, লাসবেলা ও খারান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু কালাটের শাসক খান আহম্মদ ইয়ার খান পাকিস্তান ভুক্ত হতে রাজি হননি। এই বালোচ এলাকা স্বাধীন ছিল। ১৯৪৮ সালে পাক সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিমতে স্বাধীন বালোচ অঞ্চলকে পাকিস্তান স্বশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। জিন্না নিজে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উলটে বালোচ এলাকার সঙ্গে আরও কয়েকটা এলাকা যুক্ত করে বালুচিস্তান নামে একটা প্রদেশ গঠন করে তাকে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের এই ন্যক্কারজনক বিশ্বাসঘাতকতায় কালাটের শাসক নিজেদের 'স্বাধীন' ঘোষণা করেন। জিন্না তাঁকে বোঝাতে গেলে জিন্নাকে তিনি ' প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী' বলে কটাক্ষ করেন। এরপর ১৯৪৮ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তান সরকার কালাটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ও অধীনস্থ বলে ঘোষণা করে। বালোচদের জীবনে নেমে আসে 'পরাধীনতার দিবস'। তার এক মাসের মধ্যেই এপ্রিল মাসে পাকিস্তান এই এলাকায় সেনা অভিযান চালালে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইয়ার খান সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হলেও তাঁর দুই ভাই আঘা আবদুল করিম ও মহম্মদ রহিম বালোচ বন্দুক নামাতে অস্বীকার করেন। বলাবাহুল্য, জিন্না তথা

পাকিস্তান কোনও সভ্য দেশ নয়।' তারা বালোচদের ওপর যে ধরনের নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ভারতভুক্ত কাশ্মীরিদের বিষয়ে কোনো বাক্য উচ্চারণ করার সময় পাক নেতাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতাই বালোচদের বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলে।

১৯৭৩ সালে জুলফিকার আলি ভুট্টো ফের বালুচিস্তানে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেন। তার বছর দুয়েক আগে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনার কাছে বিরাট থাপ্পড় খাওয়া পাক সেনারা সেই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হিংস্র জন্তুর মতো বালোচদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৪৮, ১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালের মতো সেবারও একইভাবে নির্যাতন চালায়। তার রূপ কী ভয়ানক হতে পারে ২০০৬ সালে ডেরা বুগতির বর্ণনাই যথেষ্ট।

বালুচিস্তান সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় অর্ধেক এলাকা শুধু নয়, পাকিস্তানের কাছে সোনার খনি। সেটা আক্ষরিক অর্থেও। এলাকাটা খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত সোনার খনিই হলো এই অঞ্চলে। সামাদ বালোচের অভিযোগ, পাকিস্তান এখন চীনের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। বালুচিস্তানের সমস্ত সোনার খনি চীনা সংস্থাগুলোর হাতে চলে গেছে। সেখানকার অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও সবই গোয়াদর বন্দরের মাধ্যমে চালান হয়ে যাচ্ছে চীনে। পাক সেনাকর্তাদেরও বালুচিস্তানকে তাদের তাঁবে রাখার প্রয়োজন আছে। সামাদের কথায়, 'পাকিস্তানি সেনাকর্তারা বালুচিস্তানের সম্পদ থেকে লাভবান হচ্ছেন। এখান থেকে লুঠ করা অর্থে তারা অনবরত সুইস ব্যাঙ্ক ভরাচ্ছেন।' পাকিস্তানে উৎপাদিত গ্যাসের ৪৫ শতাংশই উত্তোলন করা হয় বালুচিস্তান থেকে। তা পাইপলাইন দিয়ে চলে যায় পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে। অথচ বালোচরা গ্যাস পায় না। এখনও এখানকার গ্রামেগঞ্জের সাধারণ ঘরে উনুন জ্বলে খড়কুটো পুড়িয়ে। তা নিয়ে গ্রামবাসীরা যাতে টুঁ শব্দটি করতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝেই ডেরা বুগতির গৈন্ধরী গ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। তরুণ প্রজন্মকে নিস্তেজ করে রাখার জন্য আইএসআই গভীর ষড়যন্ত্র করে অতি সুকৌশলে বালোচদের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে চোরাপথে আমদানি করা মাদক বিক্রি ও মাদক সেবন চালু করে দিয়েছে। এসবের ফলে এক অন্তহীন শূন্যতা ও হতাশা ছেয়ে যাচ্ছে বালোচদের জীবনে। রেসের মাঠের ঘোড়ার মতো টগবগে একটা জাতির জীবনে শীতঘুমের ঝিমুনি চলে আসছে। তারফলে সচেতন বালোচরা আরও বেশি সচেতন ও সোচ্চার হয়ে মাঠে নামার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অবস্থাগত কারণে সাহায্য করার মতা কেউ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারছেন না। যন্ত্রণাবিদ্ধ বালোচরা পাকিস্তানের খপ্পর থেকে মক্তি পাবার জন্য ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হয়ে যতশীঘ্র সম্ভব আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণের জন্য তৈরি হচ্ছেন।

বালুচিস্তানের যন্ত্রণাকে সামনে রেখে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান নামের দেশটার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে রজ্জাক বালাচের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকেই সেখানকার সংখ্যালঘু নিপীড়ন, কাশ্মীর জবরদখলের চেষ্টা, জম্মু ও কাশ্মীরে নিরন্তর সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ করিয়ে রক্তপাত ঘটিয়ে যাওয়া, পাকিস্তানের মধ্যে ডজন ডজন সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টির প্রজননক্ষেত্র সৃষ্টি করা, পাক দখলীকৃত কাশ্মীরে শয়ে শয়ে জঙ্গিঘাঁটি তৈরি করা এবং সেখানকার অধিবাসীদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার, এককালের পূর্ব পকিস্তানে খান সেনাদের তাণ্ডব, ভারতভুক্ত পঞ্জাবে খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের সমস্ত রকমের মদত দিয়ে উপদ্রব সৃষ্টি করে রাখা এবং সাম্প্রতিক উদাহরণ— তালিবানদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনা পাঠিয়ে আফগানিস্তান দখল করানো এবং সেখানে পাক মাদ্রাসায় উৎপাদিত তালিবানদের বর্বরতা ইত্যাদি সকলের সামনেই রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে রজ্জাকের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, ' পাকিস্তান কোনও সভ্য দেশ নয়।' তারা বালোচদের ওপর যে ধরনের নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে ভারতভুক্ত কাশ্মীরিদের বিষয়ে কোনো বাক্য উচ্চারণ করার সময় পাক নেতাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। □

মহাকাশে ভারতের নতুন ঠিকানা ২০৩০ সালের মধ্যেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত মহাকাশে স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছে ২০৩০-এর মধ্যে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসভায় এও ঘোষণা করেছে যে মহাকাশে গগনযান পাঠানো হবে ২০২৩-এর মধ্যে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, 'এই পরিকল্পনাগুলি নিয়ে হয়তো আরও আগেই এগোনো যেতে পারত, কিন্তু কোভিড মহামারীর দরুন বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। ৫০০টিরও বেশি শিল্প গগনযান উৎক্ষেপণ কর্মসূচির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে চূড়ান্তভাবে আমরা ২০২৩ সালে গগনযান পাঠাতে সক্ষম হব এবং ২০৩০ সালের মধ্যেই দেশের প্রথম মহাকাশ স্টেশন স্থাপিত হবে।' তিনি আরও বলেন, ২০২৩-এ গগনযান পাঠানোর আগে প্রথমে দুটি আনক্রুড বা মনুষ্যবিহীন মিশন পাঠানো হবে। সেগুলোর রোবটিক মিশন হওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মধ্যে একটি আগামী বছরের শুরুতে পাঠানো হবে এবং দ্বিতীয় মিশন বছরের শেষ নাগাদ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান যে ক্রু এস্কেপ সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য ফ্লাইট ভেহিকলের পরীক্ষা এবং গগনযানের প্রথম আনক্রুড মিশন (জি-১) শুরু হবে আগামী বছরের দ্বিতীয়ার্ধে। এরপর বছরের শেষ দিকে দ্বিতীয় একটি আনক্রুড মিশন পরিচালনা করবে ইসরো। সেই প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। ভারতের গগনযান প্রোগ্রামটি অন্যান্য দেশের মানব মিশনের থেকে আলাদা। এটি আরও ব্যয়বহুল এবং ব্যাপকতর। মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, 'গগনযানের সাফল্যের রেশ ধরে আমেরিকা, চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে একই সারিতে উঠে আসবে ভারত। এই এলিট বিভাগে চতুর্থ দেশ হিসেবে নাম লেখাব আমরা'। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (আইএসআরও)-এর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, গগনযানের পাশাপাশি ভেনাস মিশন, সোলার মিশন (আদিত্য) এবং চন্দ্রযানের জন্য কাজ চলছে। কোভিড মহামারির কারণে বিভিন্ন মিশন বিলম্বিত হয়েছিল। তবে আগামী বছরই চন্দ্রযান পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আরেক দিকে ভারতে প্রথম মহাকাশ স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ রাজ্যসভায় বলেন, 'সব কিছু ঠিকঠাক চললে ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা একটা মহাকাশ স্টেশন স্থাপনে সক্ষম হব। মহাকাশ গবেষণার মধ্যে দিয়েই ভারতের শীর্ষে আরোহণের যাত্রা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে'।

চন্দ্রযান-৩ সম্পর্কে তিনি বলেন, '২০২২-২৩ আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এটার উৎক্ষেপনের লক্ষ্যে আমরা এগোচ্ছি'। ভারত সরকারের অনুমোদিত প্রথম যানবাহী মহাকাশ কর্মসূচির নাম 'গগনযান প্রোগ্রাম'। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় লঞ্চার রকেটের সক্ষমতা প্রদর্শন করা, যাতে মানুষকে লো আর্থ অরবিটে (এলইও) পাঠানো যায় এবং নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যায়। মন্ত্রী জানান যে, ইসরো এখনও পর্যন্ত ৩৪টি দেশের ৪২টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। এর বিনিময়ে বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার পেয়েছে ভারত।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশকে শক্তিশালী করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন লালকেল্লা থেকে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ঘোষণা করেছিলেন, তখন অনেকেই এটিকে গুরুত্ব দেননি। পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর এই চিন্তার মূলে ছিল পরিবেশ সম্পর্কিত উদ্বেগ, কারণ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য এই দুটো বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে নাগরিক এবং অনেক সংগঠন নিজেই এগিয়ে এসেছে এবং ভারতে প্রথমবার কোনও সরকারি প্রকল্প গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তারপর থেকে ১১ কোটিরও বেশি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা রেটিংয়ের ফলে এখন ভারতের প্রতিটি শহর একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ কমিয়ে আনা গেলে কঠিন ও তরল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটি ও বায়ু দূষণকারী উপাদানগুলো কমিয়ে আনা সম্ভব। এর ফলে ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর ডায়রিয়ায় প্রাণ হারানো তিন লক্ষ শিশুর জীবন রক্ষা পেয়েছে। অনুমান করা যায় পরিবার প্রতি ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

দিব্য কাশী ভব্য কাশী

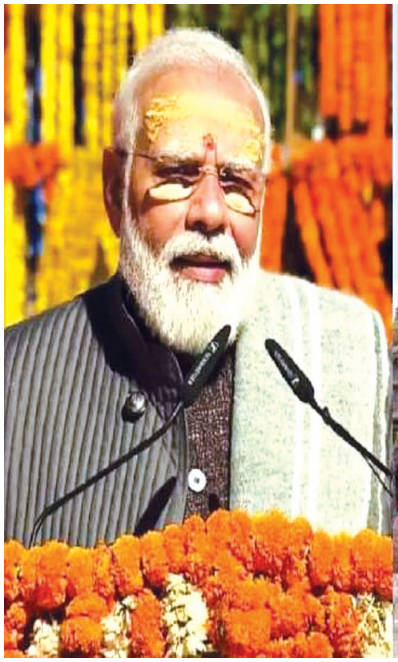

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ১৩ ডিসেম্বর সোমবার দেশজুড়ে 'দিব্য কাশী ভব্য কাশী' কর্মসূচি পালন করলো কেন্দ্রীয় সরকার। নিজের নির্বাচনী এলাকার এই প্রকল্প নিয়ে স্বপ্নের কথা এর আগে একাধিকবার উঠে এসছিল প্রধানমন্ত্রীর কথায়। ১৩ ডিসেম্বর কাশী বিশ্বনাথ করিডরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর শুরু হলো করিডর উদ্বোধনের অনুষ্ঠান। ২০১৯ সালে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন মোদী। প্রায় ৩৩৯ কোটি টাকার প্রকল্প এটি।

ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী যোগী আদিত্যনাথকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাভ্রমণের পর ডাঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করেন এবং গঙ্গায় পুজো দেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের জন্য মোদীকে শুভেচ্ছা জানালেন যোগী। তিনি বলেছেন, 'মোদীজী ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছেন। এই কাজ তারই অঙ্গ। কাশী বিশ্বনাথ ধাম হোক বা অযোধ্যার রামমন্দির, সবেতেই তার ছাপ আছে।

মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ যোগী সোমবার করিডর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রসঙ্গ আনলেন মহাত্মা গান্ধীর। তিনি বলেছেন, 'গান্ধীজী ১০০ বছর আগে বারাণসীতে এসে দুঃখ করেছিলেন। নোংরা ঘিঞ্জির মধ্যে থাকতে হয় দেখে দুঃখ পেয়েছিলেন। মহাত্মার সেই দুঃখ দূর করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।'

করিডর উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কাশীতে একজনেরই সরকার রয়েছে। যাঁর হাতে ডমরু রয়েছে। তিনি চেয়েছেন বলেই এই কাজ সম্ভব হয়েছে।'

কান্দিতে স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে শিক্ষকদের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদাতা॥ করোনা প্রাদুর্ভাবের জন্য প্রায় দু'বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর ৪টি শ্রেণীর জন্য স্কুল খুলেছে। সমস্ত স্কুলেই ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার খুবই কম। স্কুল খোলার মাসখানেক পরও সেই উপস্থিতি বাড়েনি। স্কুলে উপস্থিতি বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল মুর্শিদাবাদ জেলার জীবন্তির উদয়চাঁদ হাইস্কুল-সহ একাধিক স্কুল।

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়াতে উদয়চাঁদ হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ট্যাবলো-সহ বিভিন্ন গ্রামে মাইকিং করে, ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্কুলে আসার জন্য উৎসাহিত করতে শুরু করেন। গ্রামের মানুষরাই ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি চিনিয়ে দিচ্ছেন। কেন এই অভিনব উদ্যোগ? প্রশ্নের উত্তরে উদয়চাঁদ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জানালেন, স্কুলে উপস্থিত না হলে সিলেবাস শেষ করা যাবে না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়বে না। আমাদের দাবি সপ্তাহে ছ'দিন ক্লাস হোক। এই ভাবে প্রচারের ফলে উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করেছে ও আরও বাড়বে আশা করা যাচ্ছে।

সদ্য প্রয়াত জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ব্যক্তিগত সুরক্ষা আধিকারিক (পিএসও) সৎ পাল রাইয়ের দেহাবশেষ ১২ ডিসেম্বর, শিলিগুড়ি হয়ে তাঁর তাকদা স্থিত নিজগৃহে পৌঁছায়। ১৩ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিজন বর্মণ ও উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-প্রচার প্রমুখ সমীর ঘোষ তাঁর তাকদাস্থিত নিবাসে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে শোকবার্তা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, সৎপাল রাইয়ের পুত্র বিকল রাই সেনাবাহিনীর রাইফেলম্যান পদে কর্মরত।

সৌরশক্তি ব্যবহারে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদব জানান। ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা ৪০ শতাংশে উন্নীত করবে। ভারত সেই লক্ষ্যে অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ৪৫০ গিগাওয়াটের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এখন ক্লাসগোয় সেই লক্ষ্য ৫০০ গিগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশই অনুভব করতে শুরু করেছে যে ভারত শুধুমাত্র বিশুদ্ধ শক্তির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, ভারতও তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছে। আমরা বিশ্বের সামনে যে লক্ষ্যগুলি স্থির করেছি তা পূরণ করব এবং ভারত অবশ্যই আগামীদিনে সবুজ শক্তিতে এগিয়ে যাবে।

ফ্রেম ইন্ডিয়া জলবায়ু উন্নয়নের উদ্যোগ হিসেবে বৈদ্যুতিক যানবাহনগুলিকে গণপরিবহণে প্রচার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দেশে প্রায় ৭৪০ কিলোমিটারের একটি মেট্রো লাইন চালু হয়েছে। ২০২২ সাল নাগাদ, এটি ৯০০ কিলোমিটারের বেশি হবে। ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি মেট্রো লাইন নির্মাণাধীন।

জনজাতি সমাজের উন্নয়নে বিশেষ লক্ষ্য কেন্দ্র সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বনির্ভর ভারতকেও শক্তিশালী করতে তার শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজের সকল শ্রেণীর প্রচেষ্টা মাধ্যমেই এই সংকল্প পূর্ণ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে জনজাতিরা বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু এখন সেই অবহেলার অবসান ঘটছে কারণ দেশের বর্তমান নেতৃত্ব তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন রক্ষার জন্য জনজাতি অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর দেশে 'আদিবাসী গৌরব দিবস' উদযাপন করা হবে। ১০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম আদিবাসী গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বিরস্য মুন্ডা মেমোরিয়াল উদ্যান বা স্বাধীনতা সংগ্রামী মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছেন এবং মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে বনাঞ্চল ও দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলেও উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। জনজাতি উন্নয়নের জন্য বার্ষিক বাজেট ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সারা দেশে একলব্য মডেল স্কুলের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রস্তুত করা হচ্ছে। 'বন ধন যোজনা' জনজাতিদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, এখন অরণ্যের সম্পদ ক্ষমতায়নের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আদিবাসী শিশুদের বৃত্তির অর্থ বৃদ্ধির ফলে জনজাতি শিশুরা শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, খেলার মাঠেও তাঁদের দক্ষতার বিকাশ এবং প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। বোড়ো, ব্রু, কার্বি-সহ ভারতের প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শহরাঞ্চলের মানুষদের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙে অরণ্য, মরুভূমি, দুর্গম পাহাড়ি এলাকার সাধারণ নাগরিকরা পদ্ম পুরস্কার পাচ্ছেন, আদিবাসীরা তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি অঞ্চলের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করছে, ফল স্বরূপ এখন জনজাতি গৌরব দিবস উদ্‌যাপনের মতো ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁদের জীবনের বিকাশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তাঁদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে তাঁদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়, সরকার সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে।

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মঙ্গলবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা-৭৫' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট
প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (কালো/সাদা) ১৫০ টাকা
প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (রঙিন) ২২৫ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

With Best Compliments from :

A

WELL WISHER

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৭।।